বাঙলাকথা

কমান্ডার আবদুর রউফ

বিশেষ সংখ্যা

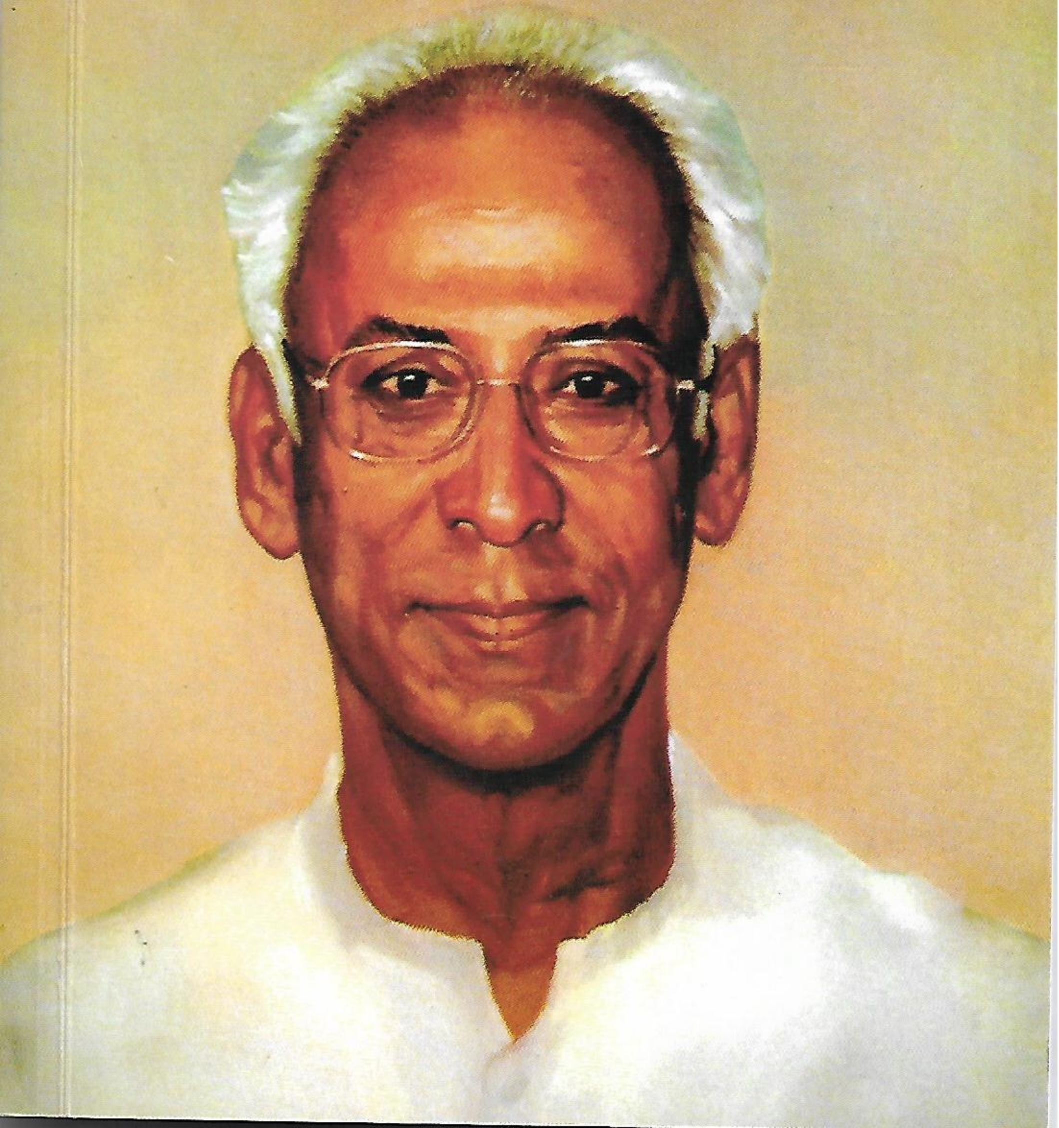

বাঙলাকথা

রেজি নং ডিএ ঢাকা ৬১০২

জানুয়ারি ২০২০

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
মো. শরীফ হোসেন

সম্পাদক
রাবেয়া সুলতানা পারু

নির্বাহী সম্পাদক
সমর ইসলাম

প্রতিবেদক
আবুল বাশার
কামরুল ইসলাম
নাইমুল ইসলাম

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
ইমরান হোসেন

দাম : ১০০ টাকা

সার্বিক যোগাযোগ
স্যুট # ১০০৮/এ, নাহার প্লাজা
হাতিরপুল, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৬৭৮-০৬০৪৯৫
০১৭০৩-২৩২২২৬
ই-মেইল : banglakotha2011@gmail.com
ওয়েব : banglakothabd.com

সূচিপত্র

কমান্ডার আবদুর রউফ স্মরণে - ০৫
আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

কমান্ডার আবদুর রউফ : স্মরণলেখ - ০৭
মাহবুবুল হক

আমার বাবা কমান্ডার আবদুর রউফ একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক - ১২
গীতালি হাসান

কমান্ডার আবদুর রউফ-এর বন থেকে বন্দর উপন্যাসের মুখবন্ধ - ১৬
ড. আনিসুজ্জামান

আত্মজৈবনিক রচনায় ইতিহাসের আলোকসম্পাত - ১৮
ড. মাহবুবুল হক

কমান্ডার (অব.) আবদুর রউফের আত্মজৈবনিক রচনায় ইতিহাসের উপাদান - ২৫
মো. শরীফ হোসেন

কমান্ডার আবদুর রউফ-এর যুগসন্ধির সুরধ্বনি - ৩২
মো. শরীফ হোসেন

কমান্ডার আব্দুর রউফের সাথে কয়েক দিন - ৩৬
অভ্র ওয়াসিম

আবদুর রউফের মুক্তিস্নান উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ ও মানবিক প্রেম - ৪০
মো. শরীফ হোসেন

উপন্যাসে ইতিহাস - ৪৬
মো. শরীফ হোসেন

নিবেদিত কবিতা : কমান্ডার আবদুর রউফ - ৫২
মো. জেহাদ উদ্দিন

আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত হিসেবে কমান্ডার আবদুর রউফ-এর কাছে উত্থাপিত প্রশ্নের লিখিত জবাব - ৫৩

কমান্ডার আবদুর রউফ। বাংলাদেশের জন্ম-আয়োজনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত। মানবমুক্তির যাত্রাপথের অক্লান্ত সারথি। মানবতার জন্য নিবেদিতপ্রাণ দেশপ্রেমিক খ্যাতিমান লেখক। এই মহান মানুষের জীবন ও কর্মের উপর বাঙলাকথার সংক্ষিপ্ত এই বিশেষ আয়োজন।

এক আকাশ স্বপ্ন থাকলেও সামর্থ্য শূন্যের কোঠায়। সত্য-সুন্দর প্রকাশে আমরা সব সময় পাঠকদের সঙ্গে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু নানা সীমাবদ্ধতায় বাঙলাকথার নিয়মিত প্রকাশনা অব্যাহত রাখা সম্ভব হচ্ছে না। তাই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও ব্যক্তির জীবন নিয়ে অনিয়মিত হলেও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ অব্যাহত রাখছি। গুরুত্বপূর্ণ এই বিশেষ সংখ্যাগুলো সকল শ্রেণির মানুষের উপকারে আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

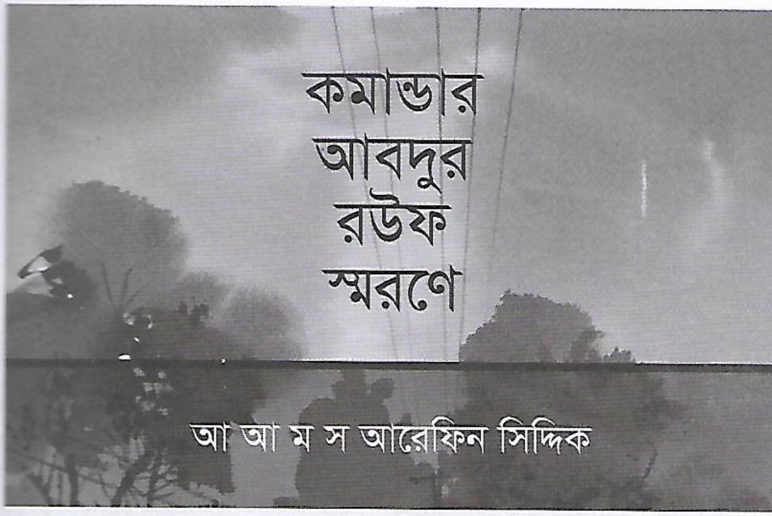

কমান্ডার আবদুর রউফ স্মরণে

আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

মানুষ মরণশীল– একথা যেমন ধ্রুব সত্য, ঠিক তেমনি একটা সত্য হলো, মানুষ অমর হয়ে রয় তাঁর কাজ, তাঁর ব্যবহার, তাঁর দেশপ্রেম, তাঁর নিষ্ঠা ও সততার মধ্য দিয়ে। কমান্ডার আবদুর রউফ তেমনি করেই অমর হয়ে রইলেন, যুগ যুগান্তর। আমরা যাঁরা বেঁচে আছি, আমাদের কাজ হলো এই ব্যক্তির কাজ, তাঁর ব্যবহার, তাঁর দেশপ্রেম, তাঁর নিষ্ঠা ও সততার কথা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা, তবেই তিনি অমর হয়ে রইবেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একজন ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন কমান্ডার আবদুর রউফ। তাঁরা একসাথে স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। আবদুর রউফ পরাভব মানেন নি, মাতৃভূমির জন্য তাঁর আকুতি তাকে প্রতিবাদী হতে শিখিয়েছিলো। তিনি দেশের জন্য যুদ্ধ করেছেন, জেল-জুলুম সহ্য করেছেন, কিন্তু মাথা নিচু করেননি। একজন নির্লোভ, সৎ ও সাহসী মানুষ কী করে মাথা উঁচু করে চলতে পারেন বা জানেন তা কমান্ডার আবদুর রউফ আমাদের দেখিয়েছেন।

কমান্ডার আবদুর রউফ কী মাপের দেশপ্রেমিক ছিলেন তাঁর একটা উদাহরণ আমি এখানে দেবো। তখন বাংলাদেশে এসেছিলেন জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের দেশীয় প্রতিনিধি একজন চাইনিজ নাগরিক মি. স্যু (Xu)। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ নতুন বিভাগ খোলার আগে আমরা একটা বৈঠকী সভায় উপস্থিত হয়েছিলাম পিএসটিসি'র মাসিক জার্নাল 'প্রজন্ম'র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে, সেটা ১৯৯৭-এর দিকে হবে।

আমরা কমান্ডার আবদুর রউফকে পেয়েছিলাম সে আলোচনায়। কারণ তিনি তখন এফ.পি.এস.টি.সি (এখন এটি পিএসটিসি নামে পরিচিত) নামক একটি সংগঠনের প্রধান নির্বাহী, জনসংখ্যা সমস্যা নিয়ে কাজ করেন। একই সাথে 'প্রজন্ম'র সম্পাদক ছিলেন তিনি। কমান্ডার রউফ প্রসঙ্গক্রমে এতো impresssive এবং এতো practical একটা বক্তব্য রাখলেন যে আমরাসহ সেদিন মি. স্যু-ও অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'কতকাল আমরা বিদেশিদের বা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকিয়ে থাকবো? আমরা আমাদের এই জনসংখ্যা সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পারি যদি এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় হতেই জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ তৈরি করার ব্যবস্থা করা যায়, তারাই এ সমস্যার সমাধান করতে পারবে। কাজেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ খোলা উচিত এবং আমি ইউএনএফপিএ-কে অনুরোধ করবো যদি পারেন, এ বিভাগ প্রতিষ্ঠায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সহযোগিতা করুন।' আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ প্রতিষ্ঠাই হয়নি, অত্যন্ত সুনামের সাথে অন্যতম বিভাগ হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছে এবং সেই ১৯৯৮ হতে আজও ইউএনএফপিএ এ বিভাগকে সহযোগিতা করে চলেছে।

এমনই ছিলেন কমান্ডার আবদুর রউফ। তাঁর কথা বলে শেষ করার মতো নয়। আসুন আমরা এ দেশপ্রেমিক, বাঙালি, জাতীয়তাবাদী, আধুনিক মনস্ক, পেশাজীবীকে বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধা করি। তাঁর বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনা করি। মহান সৃষ্টিকর্তা তাঁকে ভালো রাখুন।

লেখক: সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

bibidh
.com

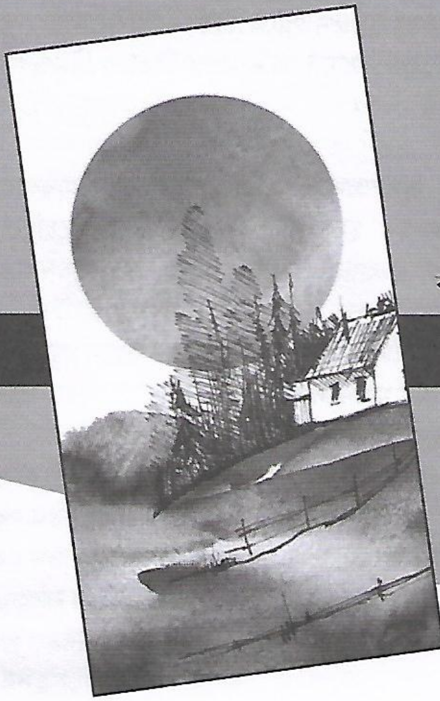

কমান্ডার আবদুর রউফ :

স্মরণলেখ

মাহবুবুল হক

২০১৫ সালের ২৭-এ ফেব্রুয়ারি চিরতরে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এক সংগ্রামী বীরযোদ্ধা কমান্ডার আবদুর রউফ। তিনি ছিলেন ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে অভিযুক্তদের একজন। এই সূত্রেই তখন তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল সবার হৃদয়ে। তিনি হয়ে উঠেছিলেন সে সময়ের সাহসী বীর নায়ক।

কমান্ডার আবদুর রউফ ১৯৩৩ সালের ১১ই নভেম্বর নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার তুলাতুলি গ্রামে নানা বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। নানা হাজী আবদুর রহিম মুন্সী ছিলেন সেই এলাকার জমিদার। আবদুর রউফের পিতা হাজী আবদুল লতিফ ছিলেন ভৈরব পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান। ছাত্রজীবনে রউফ ছিলেন যথেষ্ট মেধাবী। পাঠ্য বইয়ের বাইরে নানা ধরনের বই পড়তে ভালোবাসতেন। প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে তিনি ঢাকা সরকারি কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। পরে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া

কলেজে মানবিক বিভাগে অধ্যয়ন করেন। ১৯৫৪ সালে কিশোরগঞ্জের গুরুদয়াল কলেজ থেকে বিএ এবং ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম এ পাস করেন। ১৯৬১ সালে তিনি প্রথম বিভাগে বিএড পাস করেন ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে।

কৈশোর থেকেই রউফ ছিলেন অসাম্প্রদায়িক মন-মানসিকতার অধিকারী। রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় যুক্ত হন ছাত্রজীবন থেকে। উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন বামপন্থী প্রগতিশীল রাজনৈতিক ভাবাদর্শে। উনিশ শো চল্লিশের দশকের বাঙালি তরুণরা ব্রিটিশ শাসনের শৃঙ্খল মুক্তির যে আকাঙ্ক্ষায় উজ্জীবিত হয়েছিলেন সেই দলে রউফ ছিলেন একজন। তিনি প্রথম ছাত্রমিছিলে যোগ দেন ১৯৪৬ সালে ক্যাপটেন রশিদ আলীর মুক্তির দাবিতে। ১৯৪৮ সালে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালে অংশ নেন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে। ১৯৫০ সাল থেকে তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র থাকাকালে তিনি বামপন্থী প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হন। ১৯৫৩ সালে তিনি ঐ কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক হন। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফজলুল হক হলের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন তুখোড় ছাত্রনেতা ও সংগঠক।

বহুমুখী তাঁর জীবনের কর্মধারা। বিমান বাহিনী পরিচালিত ঢাকা শাহীন স্কুলের উপাধ্যক্ষ হিসেবে শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু। ১৯৬২ সালে তিনি পাকিস্তান নৌবাহিনীর শিক্ষা বিভাগে কমিশন পান। চাকরি নিয়ে চলে যান করাচিতে। সেখানে বাঙালি নৌসেনাদের প্রতি বৈষম্যমূলক অমানবিক আচরণ করা হতো। এর প্রতিবাদ করে কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হন তিনি। সে সময়ে রউফ পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের হাত থেকে মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। বাঙালি তরুণদের নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করেন সেনাবাহিনীর চাকরি নিতে। এসব কর্মতৎপরতা শাসকগোষ্ঠীর নজরে পড়লে তিনি তাদের চক্ষুশূলে পরিণত হন। বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের এক পর্যায়ে তাঁকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়। দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনে ১৯৬৮ সালে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। জড়িয়ে দেয়া হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সঙ্গে। কারাগারে তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সহবন্দি। ঐ মামলার প্রহসনমূলক বিচার শুরু হলে পূর্ব বাংলা প্রতিবাদী চেতনায় ফুঁসে ওঠে। বাংলার মানুষ বুঝতে পারে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে যে ছয় দফা আন্দোলন শুরু হয়েছিল

তাকে দমিয়ে দেওয়ার জন্যেই সাজানো হয়েছে এই মামলা। ১৯৬৯ সালে ছয় দফা আন্দোলন ও সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগারো দফা আন্দোলন উত্তাল গণবিক্ষোভে রূপ নেয়। পাকিস্তানি শাসকরা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। এক বছরেরও বেশি সময় কারাভোগ করে জাতীয় বীরের সম্মান নিয়ে রউফ মুক্তজীবনে ফিরে আসেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকার তাঁকে নৌবাহিনী থেকে চাকরিচ্যুত করে।

এই অবস্থায় রউফ আবার শিক্ষকতায় ফিরে যান। তিনি নরসিংদী কলেজে যোগ দেন অধ্যক্ষ হিসেবে। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি ভারতে চলে যান। সেখানে ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের গেরিলা যুদ্ধের জন্য সংগঠিত করা, তাদের প্রশিক্ষণ দান এবং গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার কাজে অংশ নেন। দেশ স্বাধীন হলে তিনি আবার নরসিংদী কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন।

১৯৭২ সালে তিনি অধ্যক্ষ পদে ইস্তফা দিয়ে সপরিবারে ঢাকা চলে আসেন। একই বছর আগস্টে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পুনর্গঠনের আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি চট্টগ্রাম নৌঘাঁটির নির্বাহী অফিসারের দায়িত্ব নিয়ে চট্টগ্রামে আসেন। পরের বছর নভেম্বরে তিনি কমান্ডার পদে পদোন্নতি লাভ করেন। বাংলাদেশের বৃহত্তম নৌঘাঁটি বিএনএস ঈসা খাঁ পুনর্গঠন ও বাংলাদেশের নৌবাহিনী গঠনে তাঁর অবদান অসামান্য। কিন্তু তিনি আবারও শিকার হন ষড়যন্ত্রের রাজনীতির। ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করার পর তাঁকে নাটকীয়ভাবে গ্রেফতার করা হয়। কোর্ট মার্শালের মাধ্যমে বেআইনিভাবে বিতাড়িত করা হয় নৌবাহিনী থেকে। ভারাক্রান্ত বেদনা নিয়ে তিনি বিদায় নিলেও একুশ বছর পর তিনি হারানো সম্মান, পদমর্যাদা ও চাকরির সুবিধাগুলো আবার ফিরে পেয়েছিলেন।

নৌবাহিনীর চাকরি হারানোর পর রউফ চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেন। সেখানে নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে দু'বছর দায়িত্ব পালন করে ঢাকায় চলে আসেন এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নামে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজে যোগ দেন। ২০০৩ সালে এই প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি অবসর নেন।

রাজনীতির মতো আবদুর রউফের সাহিত্য চর্চারও শুরু ছাত্রজীবনে। ১৯৫০ সালে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় ছোটগল্প প্রকাশের মধ্য দিয়েই তাঁর সাহিত্যিক

জীবনের সূচনা। শেষ জীবনে তিনি আবার মগ্ন হয়েছেন সাহিত্য চর্চায়। তাঁর সাহিত্যিক মনোজগতে সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের স্পষ্ট প্রভাব চোখে পড়ে।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থটি হচ্ছে আত্মজীবনীমূলক রচনা। 'আগরতলা মামলা ও আমার নাবিক জীবন' নামের এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালে। এটি আত্মজৈবনিক হলেও সমকালের ইতিহাসের অংশ হয়ে উঠেছে বইটি। সময় ও পরিস্থিতির দ্বন্দ্বময় ঘাত-প্রতিঘাত, রাজনৈতিক নানা টানাপোড়েন, ষড়যন্ত্র ও সংগ্রামের বাস্তব বাতাবরণ তাতে বহু মাত্রায় ফুটে উঠেছে। এরপর রউফ উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসে উঠে এসেছে প্রায় একশো বছরের ঘটনা পরম্পরা। উপন্যাস তিনটি হচ্ছে: 'বন থেকে বন্দর' (২০০০), 'যুগসন্ধির সুরধ্বনি' (২০০১), ও 'মুক্তিস্নান' (২০০৭)। 'বন থেকে বন্দর' আকারে ছোট হলেও এর পটভূমি বিশাল। ১৯৫৭'র সিপাহি বিদ্রোহ থেকে শুরু করে খিলাফত আন্দোলনের সূচনা পর্যন্ত কালপর্বের ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঘটনা এখানে উঠে এসেছে। 'যুগসন্ধির সুরধ্বনি' উপন্যাসের প্রেক্ষাপট অসহযোগ আন্দোলন থেকে পাকিস্তানের জন্ম পর্যন্ত। এই সময়ের সমাজজীবনের চালচিত্র ফুটে উঠেছে এ উপন্যাসে। 'মুক্তিস্নান' উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা। তবে এতে মানবিক প্রেমের দিকটি উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস 'কর্বট কন্যা' ও 'মাতঙ্গিনী দেবীর উপাখ্যান'। এসব উপন্যাসে সমসাময়িক কালের ইতিহাসের নানা ঘটনা ও তথ্যের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটবে।

আবদুর রউফ 'দেশবন্ধু' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশে অন্যতম উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করেন। সরকারি চাপে ১৯৮৭'র ডিসেম্বরে পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। তার সম্পাদনায় 'উজানস্রোত' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছিল। এক বছর নিয়মিত প্রকাশের পর এটির প্রকাশনাও বন্ধ হয়ে যায়।

আমৃত্যু আবদুর রউফ ছিলেন একজন নজরকাড়া মানুষ। তিনি ছিলেন দীর্ঘদেহী উন্নতশির। এ শারীরিক বৈশিষ্ট্যের জন্যে তো বটেই, তাঁর চিন্তা ও কর্মের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও মার্জিত রুচির জন্যেও তিনি সবার মন জয় করেছিলেন। তাঁর মধ্যে সরলতা ও দৃঢ়তার অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছিল। আমৃত্যু তিনি লালন করেছেন প্রবল দেশাত্মবোধ ও মানবমুক্তির চেতনাকে। আমাদের কালের একজন অনন্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিশিষ্টজন ছিলেন তিনি। দেশ ও মানুষ,

সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না। বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির মঙ্গল ভাবনা ছিল তাঁর অন্তরজুড়ে। জীবনের শেষ দিকে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন গণফোরামের রাজনীতির সঙ্গে।

নৌবাহিনীর কমান্ডার হলেও জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার অসাধারণ গুণ ছিল তাঁর। তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন পরিবারে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনায়, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায়। প্রতিকূলতা উত্তরণের অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। তিনি সবসময় স্বপ্ন দেখতে ও স্বপ্ন দেখাতে ভালোবাসতেন। স্বপ্নকে সফল করায় নিরন্তর সচেষ্ট থাকার অসাধারণ গুণও ছিল তাঁর।

কমান্ডার আবদুর রউফ ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন সদালাপী ও বন্ধুবৎসল। তিনি ছিলেন বৈঠকী মেজাজের লোক। সৎ, বিবেকবান ও আদর্শিক মানুষ হিসেবে তিনি অর্জন করেছিলেন সর্বমহলের শ্রদ্ধা। জীবনে নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছেন তিনি। কিন্তু সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করেছেন দৃঢ় মনোবল নিয়ে।

সামাজিক দায়বদ্ধ একজন স্বপ্নদর্শী কর্মী ও সংগঠক ছিলেন কমান্ডার আবদুর রউফ। কায়মনোবাক্যে তিনি ছিলেন একজন দেশব্রতী ও মানবব্রতী মানুষ। তিনি স্বপ্ন দেখতেন এমন এক বাংলাদেশের যে দেশে গড়ে উঠবে গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শোষণমুক্ত সমাজ, যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই ভোগ করবে সম-অধিকার।

পেশাগত ও রাজনৈতিক জীবনে দেশ-বিদেশের বহু বিশিষ্ট মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, রয়েছেন সহপাঠী, সহকর্মী, বন্ধুবর্গ ও আত্মীয়স্বজন। এ ছাড়া সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গেও ছিল তাঁর যোগাযোগ ও সম্পর্ক। তাঁর মৃত্যুতে সবাই প্রিয়জন হারানোর বেদনা অনুভব করেছেন।

এই সাহসী বীরের স্মৃতি সবাই দীর্ঘকাল স্মরণ করবেন গভীর শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায়।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও গবেষক; চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক।

আমার বাবা কমান্ডার আবদুর রউফ

একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক

গীতালি হাসান

আমার বাবা কমান্ডার (অব.) আবদুর রউফ সম্পর্কে কিছু লেখা আমার জন্য ভীষণ আনন্দের ব্যাপার। তবে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লেখার ক্ষমতা আমার নেই। কারণ তিনি এত বড় মাপের একজন মানুষ এবং তার বিচরণ এত বহুমুখী ক্ষেত্রে বিস্তৃত যে, তার স্বরূপ উদঘাটন করে তা তুলে ধরা আমার মতো একজন ক্ষুদ্র লেখকের পক্ষে সত্যিই অসম্ভব, তবুও কন্যা বলেই এ ধৃষ্টতা দেখাচ্ছি। আমি এখানে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের পরিসরে বাবাকে যেমন দেখেছি শুধু তাই তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

জ্ঞান হবার পর থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম, আমার বাবা আমাদের মাঝে নেই। এর আগে জানতাম আমার একজন বাবা ছিলেন- কিন্তু তিনি কোথায়, কেমন ছিলেন এসব বিশেষভাবে মনে করতে পারিনি। বাবার অস্তিত্ব যখন থেকে গভীরভাবে অনুভব করতে শুরু করেছি অর্থাৎ বাবার অনুপস্থিতি যখন থেকে আমাকে গভীরভাবে পীড়া দিত, তখন থেকেই তিনি জেলখানায়, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত। হয়তো ক্ষুদ্র মনে মাঝে মাঝে হাহাকার জন্ম নিত, প্রশ্ন জাগত- সবার বাবা তো বাসায় থাকে, আমার বাবা কেন জেলখানায়? এ প্রশ্নের জবাব আমি খুঁজে পেতাম না। তার বেশ কয়েকদিন পর বুঝতে পেরেছিলাম, কেন আমার বাবা জেলে।

একদিন দেখলাম, হাজার হাজার মানুষ আমার বাবাকে ঘিরে রেখেছে। শত ফুলের মালায় আমার বাবার বুক ভরিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, সেদিনটি ছিল কারামুক্তি দিবস। আমার বাবা যেদিন জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন,

সেদিন তাঁকে দেখে গর্বে আমার বুক ভরে গিয়েছিল। অবশ্য দুঃখও লেগেছিল, কারণ অনেক দূর থেকে বাবাকে দেখেছিলাম। লোকজনের চাপে কাছে ভেড়ার উপায় ছিল না। ভীষণ কষ্ট হয়েছিল আমার। প্রায় দেড় বছর বাবাকে দেখিনি। এতদিন পর বাবা যাও এলেন তাও মানুষের ভিড়ে কাছে যাওয়ার সুযোগ হলো না।

যা হোক, বেশ কিছুদিন পর দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো। বাবার কোনো খোঁজ-খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। আমার দাদি, নানি, মা ও অন্যান্যরা ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। কিছুদিন পর বাবা গোপনে বাড়ি এলেন। খবর দিলেন, বাবা মুক্তিযুদ্ধে চলে যাচ্ছেন। তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবেন।

ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি দেশকে, দেশের মাটি আর মানুষকে সত্যিকার অর্থেই ভালোবেসেছেন। একজন আদর্শ দেশপ্রেমিক হিসেবে আমি তাঁকে মূল্যায়ন করি যাঁকে কোনো ক্ষমতার মোহ অথবা প্রলোভন তাঁর নীতি আর আদর্শ থেকে এতটুকু সরাতে পারেনি। সে কারণেই আমরা হয়তো অর্থবিত্তের দিক থেকে ধনবান হতে পারিনি, কিন্তু জ্ঞান-গরিমা আর মর্যাদায় অনেক উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। একজন মুক্তিযোদ্ধার মেয়ে হিসেবে, একজন সৎ ও নীতিবান মানুষের কন্যা হিসেবে নিজেকে ধন্য মনে করি। তাঁর কারণে বাংলাদেশের যে জায়গাতে যখনই গিয়েছি, তখনই যথেষ্ট সম্মান, শ্রদ্ধা আর পরিচিতি পেয়েছি এবং এখনও পাই।

তাঁর কর্মজীবন ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। তিনি প্রথম জীবনে শিক্ষকতা করেছেন, তারপর বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন, পরবর্তীতে পুনরায় শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন এবং সবশেষে একটি এনজিও'র সংগঠক হিসেবে সারা বাংলাদেশে যথেষ্ট সাফল্য ও কৃতিত্বের সঙ্গে কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর কর্মজীবনে তিনি অত্যন্ত দক্ষতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং এখনও করছেন যার দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল। দুঃখের ব্যাপার হলো, কর্মজীবনে তাঁকে বারবার বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তিনি প্রতিবারই অসীম সাহস আর দৃঢ় মনোবলের সঙ্গে সেসব বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন। এত শত প্রতিকূলতা কাটিয়ে, এরকম সংগ্রামী কর্মজীবনে টিকে থাকা খুব কম মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

পারিবারিক ও ব্যক্তিজীবনে আমার বাবা অত্যন্ত সহজ সরল এবং সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করেছেন এবং এখনও করছেন। দেশে সুস্থ ও রুচিশীল সাংস্কৃতিক বিকাশের পক্ষে তিনি আজীবন নিবেদিতপ্রাণ। তিনি এক সময় ভালো গান গাইতেন, নাট্যাভিনয় ও নাটক পরিচালনা করতেন। সঙ্গীতানুরাগী এ মানুষটি ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান শুনে সময় পার করতে পারতেন। লেখক হিসেবেও বাবা সুপরিচিত। বহু পত্র-পত্রিকায়, ম্যাগাজিনে তাঁর লেখা ছাপা হয়েছে। তাঁর লেখা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও আমার নাবিক জীবন বইটি যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাঁর লেখা আরো কয়েকটি বই পরে প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলো হলো- বন থেকে বন্দর, যুগসন্ধির সুরধ্বনি, আমার ছেলেবেলা ও ছাত্ররাজনীতি। আরও বের হয়েছে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস মুক্তিস্নান। বইগুলো দেশপ্রেমিক ও সাহিত্যরসিকদের মাঝে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে।

মানুষ হিসেবে আমার বাবা অত্যন্ত উদার, সুবিবেচক আর দরদি। আবেগ-প্রবণ এই মানুষটি কঠিন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন অসাধারণ মানুষ। একদিকে তিনি অত্যন্ত রাগী যার কারণে পরিবারের আমরা সবাই তো বটেই, পরিবারের বাইরের লোকজনও তাঁকে ভয় পায়। অন্যদিকে তাঁর একটা অসাধারণ জাদুকরী আকর্ষণ বলে সবাই তাঁকে শ্রদ্ধার সর্বোচ্চ আসনে বসিয়ে রাখে। দ্বিমুখী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এই বজ্রকঠিন মানুষটির ভিতরে যে একটি কুসুম-কোমল হৃদয় রয়েছে তা তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এলেই বোঝা যায়।

আমার বাবাকে দেখেছি কাজ নিয়ে মেতে থাকতে, বই পড়ে, গান শুনে সময় কাটাতে, আমাদের সঙ্গে ঘরে বসে গল্প করে অথবা বাইরে বেড়াতে গিয়ে সময় কাটাতে, বন্ধু ও আত্মীয়ের সান্নিধ্যে, রাজনৈতিক মিটিং অথবা আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে আর নিজ এলাকার লোকজনের ছোটখাট সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে, এলাকার স্থানীয় কোন্দল মেটানোর প্রচেষ্টা চালাতে।

কর্মজীবনে নানান প্রতিকূলতা আর বাধা বিঘ্ন থাকলেও তাঁর পারিবারিক দায়-দায়িত্ব ঠিকই পালন করে গেছেন। যেমন তাঁর বাবা-মা ভাইবোনদের দেখাশোনা করা, আমাদের চার ভাইবোনের লেখাপড়া করানো, বিয়ে থা

দেওয়া, আমাদের যার যার অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া, আমার মায়ের মাথা গোঁজার জন্য একটু ঠাঁই করে দেয়া- এসব।

আমার মা অত্যন্ত সাহসী মানুষ। বাবার কর্মজীবনে এত প্রতিকূলতার মাঝেও তিনি আমাদের হৃদয় দিয়ে আগলে রেখেছেন। একদিন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের নৌবাহিনীকে পুনর্গঠন করার জন্য বাবা জীবনবাজি রেখে দেশগড়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু একদল অশুভ শক্তির কালো ছোবলে বাবার কর্মতৎপরতা থেমে গিয়েছিল। বাবাকে অন্যায়ভাবে নৌবাহিনী থেকে অপসারণ করা হয়েছিল এবং তাঁর ন্যায্য পাওনার সবটুকু বাতিল করা হয়েছিল। বাবা অপমান, যন্ত্রণা আর কষ্ট বুকে নিয়ে নৌবাহিনী থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। কিন্তু পাপ আর অন্যায় কোনোদিন চাপা থাকে না। তার প্রমাণ আমার বাবার জীবনেও মিলেছিল। দীর্ঘ একুশ বছর পর বাবা তাঁর হারানো সম্মান, পদমর্যাদা এবং চাকরির সুবিধাদি ফিরে পেলেন। যদিও অনেক বছর পর, তবুও তো পেয়েছেন। এটাই বাবার বিরাট সান্তনা। এটাও যদি না পেতেন তাহলেই বা কী করার ছিল?

আমার বাবা খুব আশাবাদী মানুষ। বর্তমান প্রজন্মের তরুণদের দিকে বাবা এক বুক প্রত্যাশা নিয়ে এখনও তাকিয়ে থাকেন। যেসব কাজ আমার বাবা বা বাবার মতো হাজারো মানুষ শেষ করতে পারেনি সেসব অসম্পূর্ণ কাজ বর্তমান প্রজন্মের তরুণরা নিশ্চয়ই করবে। বাবার দৃষ্টি এখন শুধু সেই দিকে। বাবার সম্পর্কে লিখে শেষ করতে পারব না। লিখতে বসলে এত সব ছোট ছোট ঘটনা, অনুভূতি আর স্মৃতি মনে পড়ে যায় যে, তাতে আমি কখনো আবেগাপ্লুত হই আবার কখনো অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ি, তাই তার প্রকাশ অন্যরকম অথবা পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়তে পারে। সুখ-দুঃখ মিশ্রিত সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো আমারই থাক। বাবা হাজার বছর বেঁচে থাকুন আমাদের মাথার মুকুট হয়ে যেমন করে আছেন বিগত বছরগুলো থেকে এ পর্যন্ত।

লেখক: আত্মজা, বিশিষ্ট নাট্যকার ও কথাসাহিত্যিক

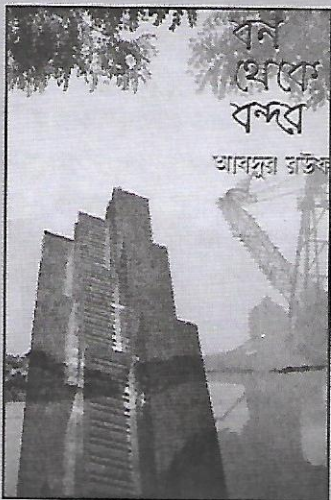

বন থেকে বন্দর
আবদুর রউফ
মীরা প্রকাশন
প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০০
দ্বিতীয় মুদ্রণ: এপ্রিল ২০০৩
তৃতীয় মুদ্রণ: অক্টোবর ২০০৫
প্রচ্ছদ: সাজেদুর রহমান
পৃষ্ঠা: ৯৬
মূল্য: ১৫০.০০

কমান্ডার আবদুর রউফ-এর
বন থেকে বন্দর উপন্যাসের মুখবন্ধ
ড. আনিসুজ্জামান

আমার বন্ধু অবসরপ্রাপ্ত কমান্ডার আবদুর রউফ সুপরিচিত হয়েছিলেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হিসেবে। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগদান করেন এবং বঙ্গবন্ধু- হত্যার পরে পুনরায় নির্যাতনের শিকার হন। এই অভিজ্ঞতার বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেন, আগরতলা মামলা ও আমার নাবিক জীবন বইতে। এর পরে স্মৃতিপ্রণোদিত হয়ে রউফ লেখেন আমার ছেলেবেলার ভৈরব। এ বইতে ১৯৪০ থেকে ১৯৫০ সালের, তাঁর শৈশব ও কৈশোরের ভৈরবের পরিবর্তমান জীবনের যে ছবি পাওয়া যায়, তা বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের অংশস্বরূপ বিবেচিত হবে। রউফ এবারে লিখেছেন বন থেকে বন্দর। আগের দিনে হলে এ স্বল্পকার কাহিনিকে আমরা বড় গল্প বলতাম। কিন্তু বাংলাদেশের সাহিত্যে বেশ কিছুকাল হলো এই আকারের গল্পকে আমরা উপন্যাস বলে বিবেচনা করে আসছি। সুতরাং বলতে পারি, রউফ এবারে উপন্যাস লিখেছেন।

ক্ষুদ্রায়তন হলেও বন থেকে বন্দর-এর পটভূমি বৃহদাকার উপন্যাসের মতো সুবিস্তৃত। এর মধ্যে সিপাহি যুদ্ধের কথা থেকে খিলাফত আন্দোলনের সূচনা পর্যন্ত নানান ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে। এই উল্লেখ কালপ্রবাহ সম্পর্কে আমাদের ধারণা দেয়। তবে লেখকের দৃষ্টি যেখানে মূলত নিবদ্ধ হয়েছে, তা হলো একটি জনপদের এবং তার মানুষের জীবনযাত্রা এবং জীবন-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির বিবর্তন। জঙ্গল কেটে আবাদ হচ্ছে; নতুন বসতি হচ্ছে; সুলতানের থেকে ইংরেজদের সেপাই হওয়ায় মর্যাদা ও বিত্ত বাড়ছে; তেজারতির বদলে জমিজমার মালিকানার দিকে আসক্তি দেখা যাচ্ছে; বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে– শুধু আকারে প্রকারে নয়, সংখ্যায় ও মানেও; ইংরেজের পাট-কোম্পানি আসছে, তাদের জায়গা করে দিচ্ছে মাড়োয়ারিরা; মাটির বুক চিরে রেললাইন বসছে– মানুষ বাস্তুচ্যুত হচ্ছে, ক্ষতিপূরণের টাকা কারো মনে হচ্ছে প্রাপ্যের অধিক; পুরনোকালের বাইজি-নটীর দিন ফুরিয়ে আসছে, সেখানে জায়গা করে নিচ্ছে অপেক্ষাকৃত সুলভ পতিতা; স্কুল হচ্ছে– মুসলমানের ছেলে স্কুলে যাচ্ছে, ভালো ফল করছে; সাম্প্রদায়িকতা দেখা যাচ্ছে– স্কুলের হেডমাস্টার, থানার দারোগাবাবু, তরুণ বক্তা, প্রধান মুসল্লি, সকলেরই ভাগ আছে তাতে, মুসলিম লীগ– খিলাফত মজলিশ গড়ে উঠছে– সামান্য চেতনা গড়ে উঠছে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে।

এই বিশাল পটভূমিতে আছে একটি কেন্দ্রীয় পরিবারের কয়েক পুরুষের কাহিনি– কিন্তু তার আশেপাশে রয়েছে অনেক নরনারী। টেলিফোন ডাইরেক্টরির মতোই এই রচনার চরিত্রের বহুলতা লক্ষ করা যাবে। লেখকের গুণ এই যে, এইসব চরিত্রকে তিনি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বে ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। এর আরেকটা প্রকাশ দেখা যায় কথোপকথনের ভাষার বদলে। আরবি-ফারসি- বস্তুত যে ভাষায় উনিশ শতকের পাত্র-পাত্রীরা কথা বলে, তা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয় দুই পুরুষের মধ্যে। সবচেয়ে বেশি পরিবর্তিত ও বিচিত্র হয়ে ওঠে জীবন সম্পর্কে পাত্রপাত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি।

বড় উপন্যাসোচিত পটভূমি এবং পাত্রপাত্রীর অধিকারকে স্বল্পপরিসরে ধরে রাখতে গিয়ে লেখক সর্বত্র নিজের রচনার প্রতি সুবিচার করেননি। পাঠক হিসেবে একটা অতৃপ্তি থেকে যায়– মনে হয়, শেষ হওয়ার আগে তাড়াতাড়ি যবনিকাপতন হলো। জিজ্ঞাসা রয়ে যায়, তারপর কী হলো? তবে সে প্রশ্ন তো আমাদের মনে জাগতে পারে যেকোনো উপন্যাসপাঠে। জীবনের প্রবাহ যেখানে বহমান, সেখানে শেষ কথা কে বলবে?

আবদুর রউফকে আমি অভিনন্দিত করি বন থেকে বন্দর লেখার জন্যে– তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপকতা, অনুভূতির গভীরতা এবং প্রকাশভঙ্গির সরলতার মধ্যে যে সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করি, আশা করি, ভবিষ্যতে তিনি তাকে পূর্ণতা দেবেন।

লেখক: জাতীয় অধ্যাপক, বাংলা একাডেমির সভাপতি
রচনাকাল: ৫ জানুয়ারি ২০০০

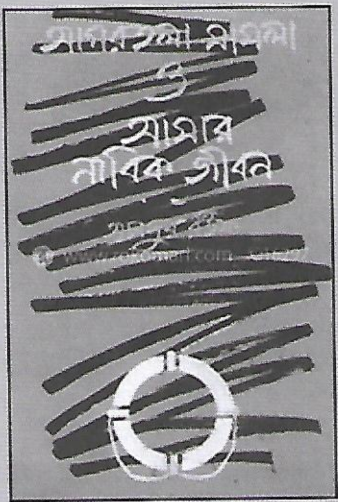

আগরতলা মামলা ও
আমার নাবিক জীবন
আবদুর রউফ
মীরা প্রকাশন
প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯২
দ্বিতীয় মুদ্রণ: ১৯৯৮
তৃতীয় মুদ্রণ: ২০০০
চতুর্থ মুদ্রণ: ২০০৩
প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী
পৃষ্ঠা: ২৪০
মূল্য: ৩০০.০০

ড. মাহবুবুল হক

আত্মজৈবনিক রচনায় ইতিহাসের আলোকসম্পাত

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ষাটের দশকের শেষার্ধ বিশেষ তাৎপর্যবাহী সময়কাল হিসেবে চিহ্নিত। এই পর্বে ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলন (সূচনা ১৯৬৬) দানা বেঁধে উঠেছিল এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মাধ্যমে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির স্বাধিকার ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে দমন করার জন্য বিশেষ তৎপর হয়ে উঠেছিল। ছয় দফার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ছাত্রদের এগারো দফার আন্দোলন। ঐক্যবদ্ধ গণসংগ্রাম ১৯৬৯-এ রূপ নিয়েছিল গণঅভ্যুত্থানের। ওই প্রেক্ষাপটেই শুরু হয়েছিল ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ।

বাংলাদেশের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। পূর্ব বাংলার জনগণের

অধিকার হরণ ও জাতিগত শোষণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এবং শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ক্রমবর্ধমান স্বাধিকার আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে ঐ মামলা ছিল ষড়যন্ত্রমূলক হীন কূটকৌশল। এই হীন তৎপরতার স্বরূপ জনগণের চোখে ধরা পড়লে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার জনগণের ক্ষোভ ও রোষ আরও পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল।

'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে পরিচিত মামলাটির সরকারি নাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য অভিযুক্ত'। মামলায় শেখ মুজিবসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র ও পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র তৎপরতায় লিপ্ত থাকার অভিযোগ আনা হয়। পাকিস্তান সরকারের হীন উদ্দেশ্য ছিল এই মামলার মাধ্যমে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসিতে ঝোলানো এবং পূর্ব বাংলার জনগণের আন্দোলনকে নস্যাৎ করা। পাকিস্তান সরকার ভেবেছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হলে পূর্ব বাংলার জনগণ শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে চলে যাবে, ফলে আন্দোলনকে দুর্বল ও স্তব্ধ করা সম্ভব হবে। কিন্তু বাস্তবে ঘটনা হলো ভিন্নতর। বিশেষ ট্রাইব্যুনালে মামলা শুরু হলে নির্দোষতা দাবি করে অভিযুক্তদের জবানবন্দি, মামলার কার্য বিবরণ ও সাক্ষীদের জেরার বিবরণ ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকলে পূর্ব বাংলার মানুষ এই স্থির ও দৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত হয় যে, এটি একটি সাজানো নাটক এবং পাকিস্তান সরকারের হীন উদ্দেশ্যই এর পেছনে কার্যকর। ফলে মামলাটি কার্যত বাঙালির চেতনাকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে এবং পরিণামে পাকিস্তানের স্বৈর শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে উনসত্তরের গণআন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। একাত্তরের সাধারণ নির্বাচন ও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব এভাবেই রচিত হয়েছিল।

এই ঐতিহাসিক মামলার ৩৫ নম্বর অভিযুক্ত ছিলেন জনাব আবদুর রউফ। তিনি তখন ছিলেন নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট। ১৯৬৮ সালের ৩রা জানুয়ারি স্বৈরাচারি পাকিস্তান সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে। মামলার অভিযুক্ত হিসেবে প্রথমে তাঁর নাম ছিল না। এর বিশেষ কারণ ছিল। গ্রেফতার করার পর তাঁকে রাজসাক্ষী হওয়ার জন্য টোপ দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে তাঁকে নানাভাবে এই মর্মে চাপ দেওয়া হয় যে, তিনি যেন শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে পাকিস্তান সরকারকে সহযোগিতা করেন। কিন্তু আবদুর রউফ ঘৃণাভরে

তা প্রত্যাখ্যান করেন। রুষ্ট ও ব্যর্থতাক্ষুব্ধ পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ তাঁকে মামলার ৩৫ নম্বর আসামি করে দেয়।

রাজবন্দী হিসেবে তাঁর ও সহবন্দীদের প্রতি পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের আচরণ ছিল অমর্যাদাজনক এবং প্রায়শই রীতিনীতি বিবর্জিত। আর বিচারের ব্যাপারটি ছিল প্রহসনমূলক। তবে তাদের সৌভাগ্য, প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে পাকিস্তান সরকার প্রহসনমূলক বিচার কাজটি শেষ করতে পারেনি। তার আগেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নিতে বাধ্য হয় এবং অন্যান্যদের সঙ্গে আবদুর রউফও মুক্তি লাভ করেন। তবে দুঃখের বিষয়, নৌবাহিনীতে তাঁকে আর ফিরিয়ে নেওয়া হয়নি।

জীবিকার প্রয়োজনে আবদুর রউফ এক সময় অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পাশাপাশি প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়েন। আওয়ামী লীগসহ একাধিক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ বজায় রাখেন।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে আবদুর রউফ একসময় আগরতলায় চলে যান। সেখানে মুক্তিযুদ্ধের পরিকল্পনা, পরিচালনা, মুক্তিযোদ্ধাদের রিক্রুট, প্রশিক্ষণ ও গেরিলা যুদ্ধ সংগঠনের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।

দেশ স্বাধীন হলে বঙ্গবন্ধুর সরকার তাঁকে নৌবাহিনীতে পুনর্নিয়োগ করলে তিনি চট্টগ্রামে স্বাধীন বাংলাদেশের নৌবাহিনী গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু পাকিস্তানে আটকে পড়া এবং মুক্তিযুদ্ধকালে নিষ্ক্রিয় কিংবা বিরোধিতাকারী পাকিস্তান-প্রত্যাগত নৌ অফিসারদেরকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে নিয়োগের পর নৌবাহিনীতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী শক্তির প্রভাববলয় সৃষ্টি হয়। ১৯৭৫-এর পটপরিবর্তনের পর তিনি ঐ অপশক্তি চক্রের ষড়যন্ত্রের শিকার হন। মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করে এবং প্রহসনমূলক বিচারে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁকে নৌবাহিনী থেকে চাকরিচ্যুত করা হয়।

আবদুর রউফ তাঁর দু'দফা নাবিক জীবনে দু-দুবার কারাবরণ করেছেন। দু-দুবার বিচারের নামে প্রহসনের সম্মুখীন হয়েছেন এবং দু-দুবার তাঁকে

ষড়যন্ত্রমূলকভাবে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। আগরতলা মামলা ও আমার নাবিক জীবন নামে যে আত্মজৈবনিক গ্রন্থ লিখেছেন আবদুর রউফ তাতে তাঁর জীবনের এই নির্মম অভিজ্ঞতার কথাই মূলত বর্ণিত হয়েছে, সে সময়ে বিরাজিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সংকটের আলোকে। তা থেকে এটাই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যে, আবদুর রউফকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে অন্যায় শাস্তি প্রদানের কারণ, বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির প্রতি তাঁর মমত্ব এবং তাঁর মাথা না-নোয়ানো দেশপ্রেম।

আবদুর রউফের এ আত্মজৈবনিক গ্রন্থটি মোট আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। যদিও উপসংহারসহ অধ্যায় সংখ্যা দাঁড়ায় নয়টি। এছাড়াও পরিশিষ্ট রয়েছে চারটি। গ্রন্থের অধ্যায় ও পরিশিষ্ট বিন্যাস এ রকম: প্রথম অধ্যায়- 'স্বাধীন বাংলা আন্দোলনে যোগদানের পটভূমি', দ্বিতীয় অধ্যায়- 'স্বাধীন বাংলা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ার পরিপ্রেক্ষিত', তৃতীয় অধ্যায়- 'গ্রেফতার ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বিচার প্রহসন', চতুর্থ অধ্যায়- 'মুক্তি ও তার পরের ঘটনা', পঞ্চম অধ্যায়- 'স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারায়', ষষ্ঠ অধ্যায়- 'স্বাধীন দেশে দ্বিতীয় নাবিক জীবন', সপ্তম অধ্যায়- 'নৌবাহিনী থেকে দ্বিতীয় বিদায়', অষ্টম অধ্যায়- 'দ্বিতীয় বিচার প্রহসন ও নাবিক জীবনের পরিসমাপ্তি', নবম অধ্যায়- 'উপসংহার'। এই অধ্যায় বিন্যাসের ক্ষেত্রে আমাদের মনে হয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় একটি মাত্র অধ্যায়ে একত্রীভূত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। চতুর্থ অধ্যায়টিকেও বাড়তি বলে মনে হয়েছে। তা সহজেই তৃতীয় কিংবা পঞ্চম অধ্যায়ের অঙ্গীভূত করা চলত।

গ্রন্থের সুদীর্ঘ পরিশিষ্ট অংশের বিষয়সূচী এ রকম: পরিশিষ্ট এক- 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সরকারি ভাষ্য : রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য আসামি'; পরিশিষ্ট দুই- 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে শেখ মুজিবের জবানবন্দি', পরিশিষ্ট তিন- 'লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের লিখিত বিবৃতি'; পরিশিষ্ট চার- '৩৫ নম্বর অভিযুক্ত লে. আবদুর রউফের জবানবন্দি'।

আবদুর রউফের গ্রন্থটি আত্মজৈবনিক হলেও সময় ও পরিস্থিতির নানা ঘাত-প্রতিঘাতে, রাজনৈতিক নানা টানাপোড়েন, ষড়যন্ত্র ও সংগ্রামের বাস্তব বাতাবরণ তাতে নানা মাত্রায় অভিব্যক্তি পেয়েছে। তা থেকে মূলত এটাই

প্রতীয়মান হয় যে, পাকিস্তানি আমলে সেনাবাহিনীতে বাঙালির প্রতি বৈষম্যমূলক ও অবজ্ঞাসূচক আচরণ মাত্রা ছড়াতে শুরু করলে করাচিতে ও অন্যত্র কর্মরত পাকিস্তান নৌবাহিনীর বাঙালি নৌ-অফিসার ও নৌসেনাদের অধিকাংশের মনই বিষিয়ে ওঠে। এদেরই একটি অংশ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা সম্পর্কে ভাবতে শুরু করেন। কেউ কেউ এ ব্যাপারে সক্রিয়ও হয়ে উঠেছিলেন। এঁদের মধ্যে আবদুর রউফ ছিলেন মন-মানসিকতা ও কর্মতৎপরতায় অধিকতর অগ্রসর ও সক্রিয়। নৌবাহিনীর সক্রিয় অংশটি এক্ষেত্রে পরিস্থিতি বিচার ও সম্ভাবনা মূল্যায়নের প্রক্রিয়ায় করাচিতে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তাঁর সমর্থন আদায়ে সচেষ্ট হয়। কিন্তু ঐ সময়ে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী শেখ মুজিবুর রহমান ষড়যন্ত্রমূলক অভ্যুত্থানের পথে কতটা সাড়া দিয়েছিলেন তা সুস্পষ্ট নয়। তবে তিনি যে তখন অগ্রসর হননি, ইতিহাস সেই সাক্ষ্যই দেয়। অবশ্য সেই সঙ্গে এটাও অনুমেয় যে, বাঙালি নৌসেনাদের কর্মতৎপরতাকে সম্ভবত তিনি নিরুৎসাহিতও করেননি।

কর্মসূত্রে প্রধানত নৌবাহিনীর অফিসার হলেও রাজনীতি-মনস্কতা ও প্রতিবাদী চেতনার অধিকারী হওয়ায় বিভিন্ন সময়ে আবদুর রউফ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন। গ্রন্থে তাঁদের প্রসঙ্গ এসেছে নানাভাবে। সেসব প্রসঙ্গ যেমন তথ্যসমৃদ্ধ তেমনি কৌতূহলজনক। তিনি অকপটে লিখেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, ন্যাপ নেতা মোজাফ্‌ফর আহমদ, কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মোহাম্মদ ফরহাদ, আওয়ামী লীগ নেতা জিল্লুর রহমান প্রমুখের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ, আলোচনা, মতৈক্য, মতভিন্নতা ইত্যাদি সম্পর্কে। নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের সম্পর্কে নিজের স্পষ্ট ও মুল্যায়নধর্মী অভিমতও ব্যক্ত করেছেন। মওলানা ভাসানীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল কিনা তা জানা না গেলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই দুই নেতার তুলনাত্মক বিচার তিনি করেছেন এভাবে: 'মওলানা ভাসানী বহুল আলোচিত পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি প্রদত্ত সেই 'আসসালামু আলাইকুম'ও আমাকে তেমন আলোড়িত করতে পারেনি। কারণ এর কোনো সুস্পষ্ট রূপরেখা ছিল না। – কিন্তু শেখ মুজিবের ৬ দফায় পূর্ব বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ছিল স্পষ্ট। তা আমার ওপর স্পষ্ট প্রভাব ফেলল।'

লেখক যে মুজিব-ভক্ত তা তিনি কোথাও গোপন করার প্রয়াস পাননি। তবে শেখ মুজিবের যেটুকু সীমাবদ্ধতা তাঁর চোখে ধরা পড়েছে তার অকপট বর্ণনাও করেছেন তিনি নির্দ্বিধায়। এ ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান খুবই স্পষ্ট। গ্রন্থে তার এই স্পষ্টবাচনের ফলে নৌবাহিনীতে ও রাজনীতিতে ব্যক্তিবিশেষের সুবিধাবাদী, আপসকামী ও স্বার্থান্বেষী ভূমিকার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু ও জিয়াউর রহমানের শাসনামলে পাকিস্তান প্রত্যাগত কিছু নৌ-অফিসারের পাকিস্তানি মানসিকতা ও ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা সম্পর্কে তাঁর সোজাসুজি সত্য ভাষণ সে সময়ের অনেক ঘটনার উপর থেকে অস্পষ্টতার আবরণ খসিয়ে দেওয়ার পক্ষে সহায়ক হয়েছে।

আগরতলা মামলা ও আমার নাবিক জীবন লেখকের চোখে দেখা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের বাস্তব চিত্র। প্রতিটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে। প্রতিটি ঘটনা বর্ণনায়, ব্যাখ্যায় ও মূল্যায়নে কাজ করেছে তাঁর শ্রেয়োবোধ এবং বাংলাদেশের প্রতি তাঁর অপরিসীম দেশাত্মচেতনা। এ ক্ষেত্রে তিনি যে যথেষ্ট রাজনীতি সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর পরিচয় বিধৃত হয়েছে অতিরেক ও আবেগোচ্ছ্বাসহীন ঘটনা বর্ণনায়, যৌক্তিক বিশ্লেষণে এবং ব্যক্তি ও সমাজের ওপর ঘটনার প্রতিক্রিয়া মূল্যায়নে।

সেই সঙ্গে এটাও উল্লেখ্য যে, ঘটনা বর্ণনায় লেখক কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতা পূর্বাপর বজায় রেখেছেন। অবশ্য কখনো কখনো তিনি সেই ধারাক্রম থেকে সরে এসেছেন, অবশ্য তা তাঁকে করতে হয়েছে ঘটনা বা চরিত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা মূল্যায়নের প্রয়োজনে।

এই আত্মজৈবনিক লেখায় রয়েছে যথেষ্ট পরিমিতিবোধ। তাতে রয়েছে অনুভূতিশীল মনের প্রাণবন্ত স্পর্শের সজীবতা। সেই সঙ্গে লেখকের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটেছে যৌক্তিক বিচার ও পরিশীলিত মননের। তাই আত্মজৈবনিক লেখাটি পড়তে গেলে গুরুভার মনে হয় না, মনে হয় না যান্ত্রিক বা ক্লান্তিকরও। এই কারণেই তা এক নাগাড়ে পড়ে শেষ করা যায়।

পাকিস্তানি শাসনামলে যাঁরা কায়েমি শাসকগোষ্ঠীকে তুষ্ট করার মানসিকতা নিয়ে এবং ব্যক্তি জীবনে সুখী গৃহকোণ রচনার পথে এগিয়েছিলেন আবদুর

রউফ তাঁদের দলে পড়েন না। তিনি সেই দলেরই একজন যাঁরা বিদ্রোহী মানসিকতা নিয়ে পূর্ব বাংলার স্বাধিকার, স্বাধীনতা ও মুক্তির মন্ত্র বুকে নিয়ে জীবন বাজি রেখে বিপদসংকুল পথে পা বাড়িয়েছিলেন। আর তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সময়ে ঘাত-প্রতিঘাতে ভরা যে জীবন তিনি অতিক্রম করেছেন আলোচ্য গ্রন্থটি তারই এক জীবন্ত চিত্র। এই বইয়ের বিশিষ্টতা এখানে যে, ব্যক্তিবিশেষের আত্মজৈবনিক রচনা হলেও সমকালীন ইতিহাসের অংশ হয়ে উঠেছে বইটি। ইতিহাস-বিকৃতির যে প্রবণতা আমাদের সমসাময়িককালে আচ্ছন্ন করেছে– এ বই এক দিক থেকে তার প্রতিবাদ। ইতিহাসের অনেক সত্য ঘটনাকে ধারণ করে রাখা হয়েছে এই বইয়ের দুই মলাটের মধ্যে।

বাংলাদেশের সমাজ-রাজনীতি সচেতন পাঠকদের নজর কাড়ার মতো নয় কেবল, বারংবার পাঠের ও সংরক্ষণে রাখার মতো বইয়ের তালিকায় এ বইটি আর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

দৈনিক সংবাদ
জানুয়ারি ২০০১

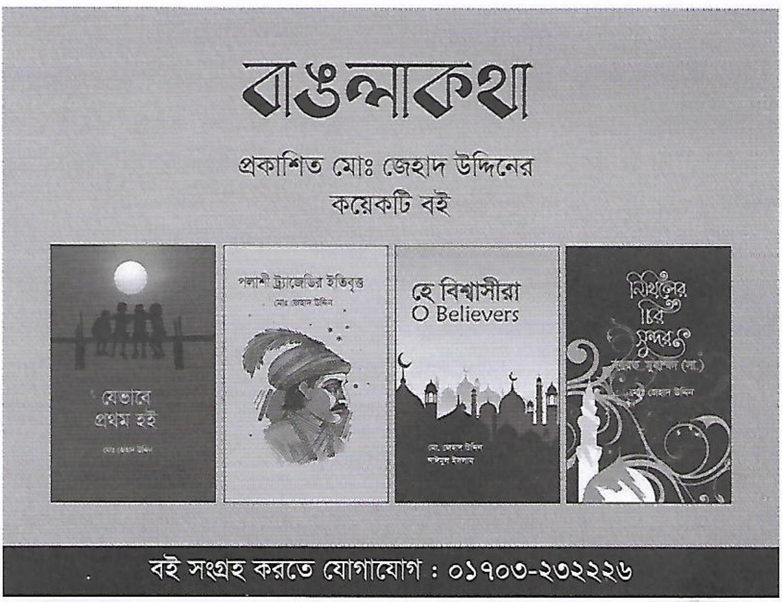

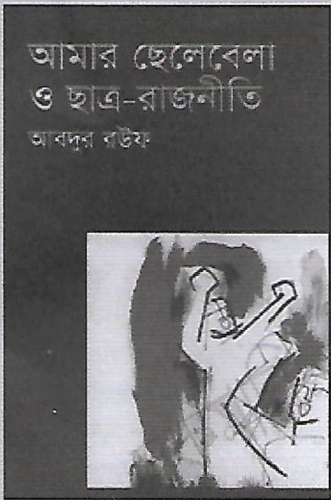

আমার ছেলেবেলা ও
ছাত্ররাজনীতি
আবদুর রউফ
মীরা প্রকাশন
প্রকাশকাল: ২০১০
প্রচ্ছদ: ধ্রুব এষ
পৃষ্ঠা: ৯৬
মূল্য: ১৫০.০০

মো. শরীফ হোসেন

কমান্ডার (অব.) আবদুর রউফের আত্মজৈবনিক রচনায়

ইতিহাসের উপাদান

কমান্ডার (অব.) আবদুর রউফ একজন প্রতিভাবান উজ্জ্বল ক্ষুরধার চেতনার অধিকারী, সাহসী ও প্রগতিশীল কৃতী পুরুষ। আবাল্য স্বদেশপ্রেমিক এই মানুষটি একটি সুন্দর সুখী ও সমৃদ্ধশালী স্বদেশ ভূমির চিন্তায় বিভোর। সেহেতু আমার ছেলেবেলা ও ছাত্র-রাজনীতি গ্রন্থে তাঁর নিজ জীবনের বাল্যস্মৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি মূলত স্বদেশ ও স্বজাতির ইতিহাস এবং এক সময়ের উলুখাগড়ায় পরিপূর্ণ মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র বিধৌত তার জন্মস্থান নব্য জনপদ বর্তমানে দেশের বিখ্যাত নদী বন্দর ও ব্যবসা কেন্দ্র ভৈরবের ইতিহাসই তুলে এনেছেন।

গোটা উনিশ ও বিশ শতকের মধ্যে সবচেয়ে ঘটনাবহুল সময়- বিশ শতকের চল্লিশের দশকটি দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশ বিভাগের মতো প্রলয়ঙ্করী ঘটনাবলি এই দশকেরই গর্ভজাত সন্তান। হাজার বছরের ইতিহাসে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাঙালি জাতি এতবড় বিপর্যয়ে আর কখনো পড়েনি। অবশ্য এই বিপর্যয়ের মধ্যে একটা বড় প্রাপ্তির স্বপ্ন ছিল।

স্বাধীন সার্বভৌম শোষণহীন স্বদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। এই বিরাট মাপের প্রত্যাশা ও বিপর্যয় জাতীয় জীবনের গতিধারাকে উর্মিমুখর করে তুলেছিল। একজন সাহসী ও সমাজ-সচেতন শিল্পীর পরিপূর্ণ দায়িত্ব ও নিষ্ঠা নিয়ে কমান্ডার (অব.) আবদুর রউফ তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে সময়ের চিত্র তুলে ধরেছেন। একই সঙ্গে তিনি অঙ্কন করেছেন যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে সম্পৃক্ত জীবনের অন্তর্লোক ও বহির্লোকের তাৎপর্যময় পরিচয়গুলো। চল্লিশের দশকের বাঙালি মুসলমান সমাজে ধর্মীয় চেতনা বিস্তার লাভ করে। সে সূত্রে ভৈরবের সমাজ জীবনেও এ ধর্মীয় প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে ফাতেহা মজলিশের আয়োজন ছিল তখনকার দিনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। লেখক তাঁর গ্রন্থটিতে উল্লেখ করেছেন, 'ফাতেহার রাতে ভৈরব বাজার এক দারুণ উৎসবে মেতে উঠত। আশপাশের গ্রামের হাজার হাজার মানুষ ভিড় করত সে রাতে। ভৈরব বাজারে মজলিশ চলত সারা রাত ধরে। নামী অনামি অনেকে ওয়াজ করতেন। আসতেন বিভিন্ন মাদ্রাসার মুয়াল্লিম কিংবা তালেবুল এলেম।' বর্তমান রাজকাচারিতে অনুষ্ঠিত হতো সে ফাতেহা মজলিশ।

পাকিস্তান সৃষ্টির পটভূমিতে ১৯৪১ সালের ১৮ এবং ১৯ জানুয়ারি তারিখে ময়মনসিংহ জেলা মুসলিম লীগ সম্মেলন পাকিস্তান পার্ক, ভৈরবে অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান বঙ্গবন্ধু সড়কে অবস্থিত 'আইস কোম্পানি' নামে পরিচিত বিস্কুটের দোকানের উল্টো দিকে যে রাস্তাটি পশ্চিমে পলাশ সিনেমা কিংবা ঘোড়াকান্দার দিকে চলে গেছে তার বর্তমান নাম আবদুল লতিফ রোড। এ রাস্তাটি তখনও ছিল। রাস্তাটির দক্ষিণে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছিল চাষের জমি। ডিসেম্বর জানিয়ারির শীতে এ মাঠে মেলা জমত বলে এটিকে বলা হতো মেলার মাঠ। এ মাঠেই প্যান্ডেল তৈরি হয়েছিল মুসলিম লীগ জেলা সম্মেলনের। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন বরেণ্য নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিম উদ্দিন, নূরুল আমীন, গিয়াস উদ্দিন পাঠান, মৌলানা আকরম খাঁ, গায়ক আব্বাস উদ্দীন আহমদ প্রমুখ। ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে সম্মেলনের একটি প্রচারপত্র গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত আছে। প্রচারপত্রটির প্রস্তাবাবলি পাঠে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, সে আমলে মুসলিম লীগের ধ্যান-ধারণাতেও একটি গণমুখী প্রগতিশীল উপাদান বিদ্যমান ছিল। তৎকালীন মহানগর ভৈরবে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনটি শুধু ভৈরবের সমাজজীবনেই নয়, সমস্ত পূর্ব বাংলার সামাজিক জীবনেও এক একটি

সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছিল। বিগত শতকের চল্লিশের দশককে কমান্ডার (অব.) আবদুর রউফ সাম্প্রদায়িক চেতনার উন্মেষ ও বিস্তারের যুগ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সে সময়ে ভৈরবে তরুণ ও কিশোরদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড। প্রতিনিয়ত সকাল সন্ধ্যায় নানা দলে প্রশিক্ষণ চলত। শরীর চর্চা, ছুরি, চাকু চালানো, লাঠি চালনা এবং সামরিক কুচকাওয়াজের মাধ্যমে মুসলিম যুব শক্তিকে প্রস্তুত করা হচ্ছিল একটি লড়াইয়ের জন্য। তবে এ লড়াই স্বজাতির স্বাধীনতা গ্রাসী ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়, হিন্দুদের বিরুদ্ধে।

নানাবিধ কারণে দেশভাগের পূর্বের বছরগুলোতে বঙ্গ প্রদেশের নানা স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে বিক্ষিপ্তভাবে লুটতরাজ, অগ্নিদাহ এবং হত্যাকা— ছিল সে সময়ের স্বাভাবিক ঘটনা। লেখক এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ভৈরবের মুসলিম লীগের তৎকালীন নেতৃত্ব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দৃঢ়তার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম ছিলেন। এ প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন ওমর তাঁর পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৩৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, ১৩ ফেব্রুয়ারি (১৩/০২/৫০) হিন্দু উদ্বাস্তু যাত্রী বোঝাই একটি ট্রেন সাম্প্রদায়িক দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং যাত্রীদের জিনিসপত্র লুণ্ঠিত হয় এবং বহুসংখ্যক যাত্রীকে হত্যা করা হয়। পিয়ার ডিলানীর রোজনামচা থেকে তিনি এই তথ্যটি সংগ্রহ করেছেন বলে জানিয়েছেন। পিয়ার ডিলানীর পূর্ব পুরুষেরা নেপোলিয়ানের সময় কুমিল্লায় জমিদারি ক্রয় করে বসতি স্থাপন করেন। শিক্ষা এবং বিবাহের জন্যে তারা বরাবরই ফ্রান্সে গেলেও প্রায় দেড়শত বছর যাবৎ তারা কুমিল্লারই অধিবাসী। পিয়ার ডিলানীর রোজনামচায় উল্লেখ আছে, ট্রেনটি নদী পার হয়ে যখন ময়মনসিংহ জেলার মধ্যে প্রবেশ করল তখন সেটিকে সেতুর উপরেই ঘেরাও করা হল। ইঞ্জিনের ড্রাইভার ইচ্ছা করেই ট্রেনটা থামিয়ে দিয়েছিল। সেতুটির দুই দিক থেকে খুনির দল যাত্রীদের আক্রমণ করল। যারা নিরাপত্তার জন্যে নদীতে ঝাঁপিয়ে এবং সাঁতরে তীরের দিকে যেতে চেষ্টা করল তাদের মাথায় ইট মেরে তাদেরকে ডুবিয়ে দেওয়া হলো। পিয়েরের মতে প্রায় এক হাজার (১০০০) হিন্দু সেইভাবে নিহত হয়েছিল।

কমান্ডার আবদুর রউফ আমার ছেলেবেলা ও ছাত্র-রাজনীতি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ভৈরবে কখনোই হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়নি। এমনকি ৫০ সালে তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী অনেক চেষ্টা করেও ভৈরবে দাঙ্গার প্রসার ঘটাতে পারেনি যদিও বিহারী দাঙ্গাকারীরা চলন্ত ট্রেন

থেকে মেঘনা ব্রিজের উপরে অনেক অমুসলমানকে মেরে কেটে ফেলে দিয়ে স্থানীয় লোকদেরকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেছে। ভৈরববাসীরা বরং সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেছে।

তবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকলেও জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার অভাবে পাকিস্তান সৃষ্টির পর অনেক ধনী হিন্দুই দেশত্যাগ করেছেন যা কমান্ডার আবদুর রউফ তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন।

সাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনা প্রসঙ্গে তিনি তাঁর বাল্যকালের ছোট অথচ অর্থবোধক ও মর্মস্পর্শী একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

তাঁরই ক্লাসের বীথি নামের এক হিন্দু মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ঘটনাক্রমে একদিন সম্ভ্রান্ত হিন্দু পবিারের এই বান্ধবীটির বাড়িতে তিনি প্রবেশ করেন। বিষয়টি বাড়ির মুরুব্বিরা সহজে মেনে নেননি। লেখকের এ অপরিণামদর্শিতার কারণে তাঁর বান্ধবী বীথিকে মার খেতে হয়েছিল। মুসলমানের ছেলে উঠানে পা রাখার কারণে যে পরিবারের জাত কুল নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছিল সে পরিবারের মেয়ে মুসলমান বাড়িতে (লেখকের বাড়িতে) মুসলমান ছেলের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়েছে এতে মুসলমানদের জাত নষ্ট হয়নি। এ ঘটনা বিশ্লেষণে তৎকালীন সম্ভ্রান্ত হিন্দু সমাজের হীনম্মণ্যতারই প্রকাশ ঘটে।

কমান্ডার (অব.) আবদুর রউফ শিশু বয়সে পঞ্চাশের মন্বন্তর প্রত্যক্ষ করেছেন। সর্বনাশা এই দুর্ভিক্ষে বহুলোক মৃত্যুবরণ করেন। পঞ্চাশের মন্বন্তর প্রসঙ্গে লেখক উল্লেখ করেছেন:

জীবন যাপনে জাগতিক চাহিদা ন্যূনতম থাকলেও বিপদে আপদে পরস্পরকে সহায়তা করার কোনো কৃপণতা ছিল না। জমিদার, মহাজন ও শাসক সম্প্রদায় থেকে নিজেদের আলাদা ভাবলেও নিজেদের মধ্যে একাত্মবোধ ছিল আবহমানকাল থেকে। ইংরেজ শাসনের বেনিয়া প্রক্রিয়ায় কেউ কেউ সাধারণ থেকে অনন্য সাধারণ হয়ে কিছু উপরে উঠে জমিদার মহাজন কিংবা শাসকদের সহবতে আসার সুযোগ যেদিন থেকে পেল ধর্ম বিশ্বাসের তেলবুদ্ধি শ্রেণি অবস্থানের ভেদবুদ্ধি সেদিন থেকেই শুরু। ইংরেজ সৃষ্ট ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষ

তাদেরকে আবার এক কাতারে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। তারা একযোগে বিনা প্রতিবাদে নিজের ভাগ্য লিখনকে মেনে নীরবে মৃত্যুবরণ করেছিল।

শৈশবে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন ভয়াবহ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। তিনি বলেছেন, যুদ্ধের বাজারে অগণিত মানুষের জীবন যাপন রুজি রোজগারকে একদিকে যেমন বিপর্যস্ত করেছিল, তেমনি কারো কারো সামনে অকল্পনীয় সুযোগ এনে দিয়েছিল। তবে এর কতটুকু ন্যায়-নীতি নির্ভর সেটা বিতর্কের বিষয়। তেজী বাজারে অনেকে ব্যবসা করেছে। কেউ ফটকাবাজি করেছে। কেউ কেউ ডাকাতির মালামাল বিক্রয় করেছে আবার কেউ চোর ডাকাতির থাইলতদারীরও করেছেন। মোট কথা, ফুলে ফেঁপে উঠেছে অনেকেই সে সময়ে হঠাৎ করে।

চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস, সনাতন মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদি তৎকালীন অর্থনৈতিক জীবন ও সমাজ ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন এনেছিল। যুদ্ধকালীন সময়ের ছোট ছোট ঘটনা তার স্পর্শকাতর শিশুমনে নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। সম্ভবত সে উপলব্ধিই তাঁকে দেশপ্রেমিক ও জীবনযুদ্ধে মানবিক হতে সহায়তা করেছে। মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র সংগমস্থলের চিরচেনা প্রকৃতির অপরূপ লাবণ্যের মধ্যে সংগ্রামী মানবগোষ্ঠীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী রূপকার হিসেবে কমান্ডার (অব.) আবদুর রউফ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ সৃষ্টিশীল মানুষ অমর হয়ে থাকেন তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়েই।

আমার ছেলেবেলা ও ছাত্র-রাজনীতি একটি বিশেষ সময়ের প্রতিচ্ছবি। গ্রন্থটিতে ইতিহাসমোদিরা খুঁজে পাবেন ইতিহাসের উপাদান। কিন্তু একজন মহৎ মানুষের জীবনালেখ্য হিসেবেও এ গ্রন্থের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। মহৎ লোকের জীবনালেখ্য বা জীবনস্মৃতি সর্বস্তরের মানুষের চিত্তকেই আকর্ষণ করে। বিশেষ করে শিশুমনে আনন্দের ঝড় তুলে। শিশুকে দৃঢ় প্রত্যয়ী ও আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করে। এ গ্রন্থ পাঠে শিশুরাও আনন্দ পাবে। লেখক অত্যন্ত নিখুঁতভাবে অঙ্কন করেছেন একটি শিশুর সুখ-দুঃখের অতীত স্মৃতি এবং এটা সম্ভব হয়েছে তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণে। এ প্রসঙ্গে ড. এম. বদরুদ্দোজা গ্রন্থটির ভূমিকায় লিখেছেন:

সেদিনের সামাজিক ধর্মীয় কৃষ্টি, যৌথ পরিবার ও গোষ্ঠ জীবনের অনুকূল পরিবেশে শৈশব কৈশোর ছিল প্রাণবন্ত, সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ ভালোবাসায়

পরিপুষ্ট। সার্বিক মূল্যবোধ, মুক্তচিন্তা ও ন্যায়নিষ্ঠা ছিল উদীয়মান মুসলিম মধ্যবিত্ত জীবনের অনমনীয় ভিত। ঔপনিবেশিক শাসন ও সামাজিক-অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্য থেকে মুক্তি লাভের স্বপ্ন দেখত সেদিনের অনেক কিশোর। কমান্ডার আবদুর রউফ সে কিশোর সমাজের অন্যতম। উপরন্তু তাঁর ছেলেবেলায় পাশাপাশি ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতিপূর্ণ শ্রদ্ধা এবং বস্তুনিষ্ঠ মুক্তচিন্তার প্রতি প্রবল আকর্ষণ, যা তখনকার সমাজ চিন্তায় বেশ কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী।

গ্রন্থটি পাঠে জানা যায়, বাঙালি মুসলিম সমাজের তৎকালীন রেওয়াজ অনুযায়ী স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে আরবি শিক্ষার জন্যে তাঁকে ভর্তি করা হয় তাঁর মামার বাড়ি রায়পুরার তুলাতুলি গ্রামের একটি মক্তবে। অতঃপর ১৯৪১ সালে তিনি ভর্তি হন ভৈরব ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে। এখান থেকেই শুরু হয় তার আনুষ্ঠানিক ছাত্রজীবন। বাল্যকালে তিনি ছিলেন খুব সাদাসিধা, তবে মেধাবী, দৃঢ় প্রত্যয়ী ও পাঠ্যগ্রহী ছাত্র। তার বাল্যকাল সম্পর্কে তিনি বলেছেন:

তুলাতুলি গ্রামের মক্তব থেকে ভীতু ও বোকা রউফের ভৈরবী হয়ে পড়তে সময় লেগেছিল। বাড়ির পূর্বপাশে মনামরা খালে বর্ষার দিনে লাফালাফি-ঝাঁপাঝাঁপি করে, মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের জুনিয়র গ্রুপে পিটি প্যারেড, কারো সঙ্গে ঝগড়া করে, কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, আবার কারো সঙ্গে মান অভিমান করে দুয়েক বছরের মধ্যে আমি ভৈরবী হয়ে উঠলেও আমার জীবনের গণ্ডি ছিল খুবই সীমিত। ভীতু ও বোকা বোকা ভাবটা থেকেই গিয়েছিল, শরীর স্বাস্থ্যও ছিল খুবই হালকা-লম্বা লিকলিকে, যেন জোরে বাতাস এলে পড়ে যাব।

হালকা-লম্বা লিকলিকে বোকা বোকা ছেলেটি ছিল খুবই জেদী ও আত্মপ্রত্যয়ী। প্রথম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আত্মগর্বে বুক ফুলিয়ে যখন বাড়ি ফিরছিলেন সে আনন্দঘন মুহূর্তে তাঁর চাচা জিন্নাত আলীর তিরস্কারে শিশু আবদুর রউফ প্রতিজ্ঞা করে বলেন যে, তিনি আবদুর রউফ 'টু' হয়ে বসে থাকতে চান না। তাকে হতে হবে আবদুর রউফ 'ওয়ান'। ঘটনাটি অতি সামান্য হলেও শিশুটির চিত্তের এই দৃঢ়তা তাঁর পরবর্তী চিন্তা চেতনাকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। তিনি আবদুর রউফ 'ওয়ান' হতে পেরেছিলেন কিনা তা তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। কিন্তু জীবন বাস্তবতার সঙ্গে সংগ্রাম করে দেশপ্রেমের মহান ব্রতে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন একথা বলা যায়। একটি মানব শিশুর মাঝে সুপ্ত থাকে বিপুল সম্ভাবনা।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে প্রতিটি শিশুই অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলতে পারে। কমান্ডার আবদুর রউফের ঘটনাবহুল জীবন এর বাস্তব উদাহরণ।
১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিল তারিখে নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি নয়াদিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাংলাদেশের একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু তৎকালীন রাজনীতির গতিধারায় তাঁর এ প্রস্তাব বাস্তবে রূপ লাভ করেনি। বাংলাদেশ স্বাধীন হবে না একথা জেনে শিশু আবদুর রউফ খুবই মর্মাহত হয়ে পড়লেন।

তিনি বাল্য স্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন:
সেই অপরিণত বয়সের বুদ্ধি দিয়ে স্থির করলাম এ ব্যাপারে কিছু একটা করা প্রয়োজন। কী করা যায় এই নিয়ে অনেক শলাপরামর্শ করতাম আমার প্রতিবেশী বন্ধু জহিরুল হকের সঙ্গে। দুই বন্ধুতে পরামর্শ করে স্কুল পাঠ্য ইতিহাসের শিবাজীর মতো একটি গেরিলাবাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। দুই বন্ধুতে মিলে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে তীর ধনুক তৈরি করলাম, কুচের কালি লাগিয়ে তীরগুলোকে মারাত্মক করার চেষ্টা করলাম এবং মেঘনা ব্রিজের কাছে রেললাইনের দক্ষিণ পাশের ঢালে আকন্দ গাছের জঙ্গলায় তীর ধনুক চালনার অনুশীলন শুরু করলাম। কিছুদিনের চেষ্টার পর আমাদের গেরিলা বাহিনীতে তৃতীয় সদস্য যুক্ত করতে না পারার কারণে এক সময় হতাশ হয়ে এত বড় মহতী উদ্যোগটিকে বালিত করে দিতে বাধ্য হলাম।

অপরিণত বয়সের দুই বালকের এরকম উদ্যোগ হাস্যকর মনে হলেও মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জনে তাদের যে আগ্রহ এবং আন্তরিকতা ছিল বিস্ময়কর আগ্নেয়গিরির মতো যা পরিণত বয়সে বিস্ফোরিত হয়েছিল কমান্ডার (অব.) আবদুর রউফের সৈনিক জীবনে। ১১২ পৃষ্ঠায় ১৫টি পরিচ্ছদে কমান্ডার (অব.) আবদুর রউফ তার ছেলেবেলার স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ আমার ছেলেবেলা ও ছাত্র-রাজনীতি গ্রন্থটি সমাপ্ত করেছেন। বইটি সুখপাঠ্য, ভাষা প্রাঞ্জল এবং ঘটনা বর্ণনে কোনো জটিলতা নেই। লেখায় রয়েছে যথেষ্ট পরিমিতিবোধ এবং অনুভূতিশীল মনের সজীবতা। তাই লেখাটি পড়তে গেলে গুরুভার মনে হয় না।

পরিশেষে বলা যায়, ইতিহাসের উপাদান হিসেবে বইটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি শিশুসাহিত্য হিসেবেও এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।
সাপ্তাহিক নিরপেক্ষ অরুণিমা, এপ্রিল ২০০২

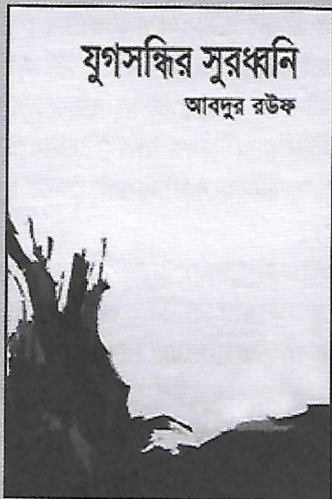

যুগসন্ধির সুরধ্বনি
আবদুর রউফ
মীরা প্রকাশন
প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি ২০০০
প্রচ্ছদ: সাজেদুর রহমান
পৃষ্ঠা: ৯৬
মূল্য: ১৫০.০০

মো. শরীফ হোসেন

কমান্ডার আবদুর রউফ-এর

যুগসন্ধির সুরধ্বনি

ছোট শহর ভৈরব। এক সময়ের উলুখাগড়া বন আজ ভৈরব বন্দর, দেশের বিখ্যাত ব্যবসা কেন্দ্র। ভাটি অঞ্চলের সিংহদুয়ার, সংগ্রামের কিংবদন্তির শহর ভৈরব জনপদের অতীত ঘটনাবলি নিয়ে লেখা কমান্ডার (অব.) আবদুর রউফের বন থেকে বন্দর উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাবলির ধারাবাহিকতায় অনেকটা গ্রামীণ পটভূমিতে আত্মপ্রত্যয়ী মানুষদের জীবন-সংগ্রামের অনবদ্য আলেখ্যসমূহের সমন্বয়ে তিনি রচনা করেছেন যুগসন্ধির সুরধ্বনি উপন্যাসখানা। এ গ্রন্থ পাঠে বন্দর নগরী ভৈরব সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের জানার এবং বোঝার আগ্রহ সৃষ্টি হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। উপন্যাসের নায়ক কাসেম। ভৈরবের আলো বাতাসে সে বেড়ে উঠেছে। পাখির ছানা যেমন জন্মের পর পরই চোখ মেলে দেখে একটি সাধারণ নীড়,

পাখা ঝাপটায়, উড়তে শিখে, তারপর প্রত্যক্ষ করে অসীম আকাশ, নদী, প্রান্তর তথা সুবিশাল জগত। এ উপন্যাসের নায়ক কাসেমকেও তিনি তেমনিভাবে আস্তে আস্তে বড় করে তুলেছেন। উপন্যাসটির পূর্বকথায় লেখক উল্লেখ করেছেন:

অসহযোগ আন্দোলনের হুজুগে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেয়া কিশোর কাসেমকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এ উপন্যাসের কাহিনি। কালস্রোতে কাসেমও গা ভাসিয়েছিল যেন নিয়তি-নির্ভর করে। দিন গেছে, বছর গেছে। এর মধ্যে একটা বিশ্বযুদ্ধ পার হয়ে গেছে, দেশ ভাগ হয়ে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে, এদেশের অনেক হিন্দু দেশ ছেড়ে গেছে, ওদেশ থেকে মুসলমান মোহাজের এসে হাজির হয়েছেন জীবিকা আর নিরাপত্তার সন্ধানে। বদলেছে জনপদ, বদলেছে এ জনপদের মানুষ আর তাদের সমাজ গঠন।

তাঁর বিশ্বাস যুগসন্ধির সুরধ্বনি এ কাহিনি আমাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ও নিশ্চিত পরিসমাপ্তির দিকে নিয়ে যাবে আর উন্মোচিত করবে আমাদের চোখের সামনে অন্যতম এক দিগন্ত।

লেখকের এ উক্তির সূত্র ধরেই বলা যায়, এ উপন্যাসে তিনি মূলত সমাজ চিত্রই অঙ্কন করেছেন। এ প্রসঙ্গে আধুনিক বাংলা উপন্যাসের নির্মাণ কৌশল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত আবশ্যক।

বিশ শতকের তৃতীয় দশকের শুরুতেই বাংলা কথাসাহিত্যে আধুনিকতার নতুন হাওয়া এসে লেগেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের কাল পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের সামাজিক পটভূমি মোটামুটি একই রকম ছিল বলা যায়। এর আগে উনিশ শতকে গ্রামীণ সমাজ জীবনে তেমন কোনো গভীর আলোড়ন প্রত্যক্ষ করা যায় না; অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার পরিবর্তনও তেমন ব্যাপক হয়নি। গ্রামের জমিদাররা শহরে আশ্রয় নিতে শুরু করলেও গ্রাম-জীবনে আলোড়ন ও ভাঙন দেখা দেয়। মধ্যস্তরের মানুষের মধ্যে জাগরণ ঘটতে শুরু করে। জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ গ্রামাঞ্চলেও গিয়ে পৌঁছায়। এসবের প্রভাব স্বভাবতই সাহিত্যে পড়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবসায় সংকট সৃষ্টি করেছিল। তার বিষময় ফল এবং নৈরাশ্য, অবক্ষয়, বিশ্বাসের সংকট ইত্যাদি বাঙালির জীবন ও সমাজকে গ্রাস করে সমাজ জীবনে যে ভাঙন এনেছিল তার রূপটিকে লেখক বাস্তব দৃষ্টিতে তুলে ধরতে চেয়েছেন কথা-সাহিত্যের মধ্য দিয়ে।

কমান্ডার (অব.) আবদুর রউফের প্রচেষ্টাখানাও অনুরূপ। অসহযোগ

আন্দোলনের হুজুগে। কাসেমের পিতা আহমদ বেপারী কাসেমকে বিদ্যালয় থেকে ছাড়িয়ে নেয়। কাসেম বিদ্রোহ করতে চেয়েছিল, কিন্তু না-বিদ্রোহ করতে পারেনি। অবনত মস্তকে পিতৃ-আদেশ মেনে নেয়ার বহুদিনের সংস্কারটুকুকে সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তবে সতেরো আঠারো বছরের টগবগে তরুণ আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে জীবন-সংগ্রামে দণ্ডায়মান যুধিষ্ঠির। তারই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রমেশ বাবুর আদর্শ হৃদয়ে লালন করে আশায় বুক বেঁধে বসে আছে।

কুসংস্কার আর ধর্মান্ধতার নাগপাশ থেকে বুদ্ধিকে মুক্ত করবে। আমাদের এই অভিযাত্রা, অন্ধকার থেকে আলোর পথে, অসত্য থেকে সত্যের পথে, মৃত্যু থেকে অমরত্বের পথে...।

অতঃপর রমেশ বাবুর, স্ত্রী-পুত্র পরিজন নিয়ে জন্মস্থান এবং পৈত্রিক ভিটেমাটির মায়া ছেড়ে চিরদিনের মতো দেশ ত্যাগ করলেন। সামাজিক অনাচারের কাছে রমেশ বাবু পরাস্ত হলেন।

হামিদ মিয়া আর বেরতী বর্মণ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক আবদুর রউফ বলেছেন:

এর মধ্যে একটা বিশ্বযুদ্ধ পার হয়ে গেছে, দেশ ভাগ হয়ে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে, এদেশের অনেক হিন্দু দেশ ছেড়ে চলে গেছে, ওদেশ থেকে মুসলমান মোহাজের এসে হাজির হয়েছে জীবিকা আর নিরাপত্তার সন্ধানে। দেশ ভাগের পরেও মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ না দেখে লাখ ইনসান ভুখা হ্যায়, ইয়ে আজাদি ঝুটে হ্যায় বলে হামিদ মিয়া রেবতী বর্মণ কৃষক-মজুরের আন্দোলন শুরু করার পাঁয়তারা করতে গিয়ে সরকারের বিরাগভাজন হয়েছে। রেবতী বর্মণ দেশ ছেড়ে পালিয়ে বেঁচেছে। আর হামিদ গ্রেফতার হয়ে জেলে গেছে। বদলেছে ভৈরবের মানুষ আর তাদের সমাজ গঠন।

এমনিভাবে সমাজ বাস্তবতার কাছে পরাস্ত রেবতী বর্মণ, পরাস্ত হলো হামিদ মিয়া।

উপন্যাসটির নায়ক কাসেম এসব ঘটনার নীরব সাক্ষী। সে তার শিক্ষক রমেশ বাবুর অমরাত্মার ক্রন্দন শুনেছে, রেবতী বাবুর পলায়ন দেখেছে, দেখেছে যৌবন-দীপ্ত সুপুরুষ আবদুল হামিদ রাষ্ট্রনায়ক যন্ত্রের যাঁতাকলে কীভাবে নিষ্পেষিত হয়েছেন।

আরো একজনের কথা বলা যায়, ঔপন্যাসিক যার নাম দিয়েছেন রোশন ভাবী। বছর ত্রিশেক আগে ঢাকার মির্জা মহলে যার জন্ম হয়েছিল। রূপে-গুণে দুনিয়াটা রোশনাই করবে কামনা করে দাদিজান যার নাম দিয়েছিলেন রোশন আরা। ক্রমে ক্রমে যে মেয়েটি বেড়ে উঠেছিল মখমলের ঘাঘরা আর পাতলা

কামিজের আড়ালে, লতিয়ে উঠেছিল যার নিটোল দেহ। গ্রীবাভঙ্গি ছিল যার অপূর্ব। চটুল কটাক্ষে যে ছড়িয়ে দিতে পারত আগুনের হিল্লোল। মির্জা বাড়ির ঐশ্বর্যের আগুনে এ অনন্ত যৌবনা রোশন ভাবী কীভাবে জ্বলে পুড়ে অঙ্গার হয়েছে, তাও কাসেম লক্ষ করেছে। প্রতিকারের কোনো সামর্থ্যই তার নেই। কাসেম উপন্যাসের নায়ক। তাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের ঘটনাক্রম আবর্তিত হয়েছে। প্রথম থেকেই কাসেম অপূর্ণাঙ্গ চরিত্র, তার কোনো উদ্ভব নেই। বিকাশ নেই, নেই কোনো পরিণতি। প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাস্রোতে তাকে যেদিকে ভাসিয়ে নিয়েছে সে সেদিকেই গিয়েছে। তবে কাসেম তার শিক্ষকের মতোই জীবনের গতিতে বিশ্বাসী আর এ গতিটা হলো, অন্ধকার থেকে আলোর পথে, অসত্য থেকে সত্যের পথে, মৃত্যু থেকে অমরত্বের...। কাসেম জীবনে কিছুই করতে পারেনি। তাই তার অতৃপ্ত আত্মা তারই সন্তানের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পেতে চায়। ভাষা আন্দোলনের মিছিলের অগ্রভাগে তার ছেলেকে দেখে আশায় বুক বেঁধেছে, তার বিশ্বাস নতুন প্রজন্মের এ ছেলেরা মহাকালের অবিনশ্বর স্রোতে গা ভাসাবে না- নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে।

উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনা কাসেমের ছেলে শফিকের হাত ধরে চলমান। অর্থাৎ যুগসন্ধির সুরধ্বনির কাহিনিরও পরিসমাপ্তি ঘটেনি, ঘটবেও না কোনোদিন। কারণ ঔপন্যাসিক ইতিহাসের কথা বলেছেন। ইতিহাস কোথাও থামে না।

সমাজবীক্ষণ যদি আধুনিক ঔপন্যাসিকের অন্যতম লক্ষণ হয়, তবে যুগসন্ধির সুরধ্বনির স্রষ্টা আবদুর রউফ একজন সার্থক ঔপন্যাসিক। কারণ সমাজচিত্র অঙ্কনে তিনি খুবই সচেতন। মানব জীবনের অন্তর্বাস্তবতার জগতে সন্ধানী আলো ফেলে মানুষের আতঙ্ক, নৈরাশ্য, শূন্যতা, যন্ত্রণা, উদ্বেগ, বিচ্ছিন্নতা এবং দুর্বল অস্তিত্ব সংকটকে তার সাহিত্যে তুলে এনেছেন। বুর্জোয়া সমাজের মূল্যবোধহীনতা, ঈশ্বর বিশ্বাসের বিশাল শূন্যতা এবং যন্ত্রণাদগ্ধ মানুষের মনোজগতের রক্তক্ষরণকে তিনি দেখিয়েছেন তার সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে। সুতরাং বলা যায়, শিল্প সিদ্ধিতে এবং সমাজ বিকাশের ইতিহাস হিসেবে কমান্ডার আবদুর রউফের যুগসন্ধির সুরধ্বনি একটি অনন্যসাধারণ উপন্যাস।

তথ্য নির্দেশ:

১. ভবতোষ দত্ত- গতিশীল সমাজ ও বাংলা উপন্যাস

২. ড. শিরীণ আক্তার- বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক

সাপ্তাহিক নিরপেক্ষ অরুণিমা

অক্টোবর ২০০০

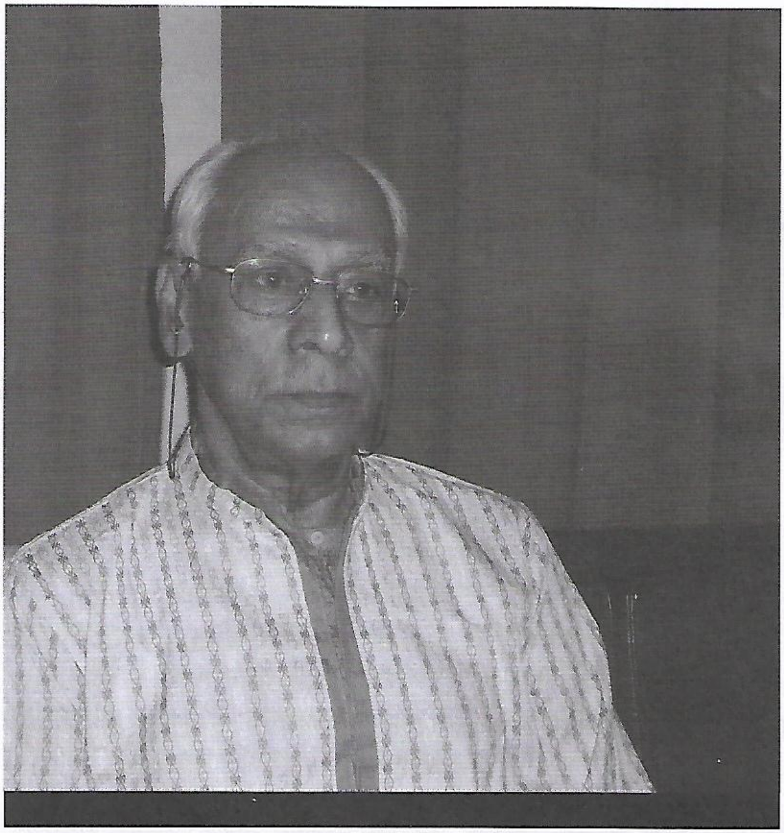

কমান্ডার আব্দুর রউফের সাথে কয়েক দিন

অভ্র ওয়াসিম

২০০৪ সালের জানুয়ারিতে সাবেক রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ডা. এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী স্যারের (ডা. বি. চৌধুরী) বিকল্পধারা বাংলাদেশ রাজনৈতিক দলের রিসার্চ ইউনিটে আমি গবেষণা সমন্বয়ক হিসেবে যোগদান করি। এরই ধারাবাহিকতায় একসময় কমান্ডার আব্দুর রউফ ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় হয়। প্রায় ৬ ফুট লম্বা একহারা গঠনের একজন সৌম্যদর্শন মানুষ। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সর্বকনিষ্ঠ অভিযুক্ত। আর এক নম্বর আসামি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

যতদূর সম্ভব ২০০৫ সালের অক্টোবর মাসের এক সন্ধ্যায় বিকল্পধারা বাংলাদেশের মুখপাত্র মাহী বি চৌধুরী (মাহী ভাই) আমাকে বললেন, 'ওয়াসিম ভাই, আজ আপনি একটু থাকবেন।' আমি শুধু বললাম, ঠিক আছে। আমার ধারণা ছিল আমরা যে গবেষণার কাজ করছি তা নিয়ে দলের প্রেসিডেন্ট ডা. বি. চৌধুরী স্যারের সাথে কথা বলব। আমরা মূলত জাতীয় নির্বাচন ১৯৯১, ১৯৯৬ (জুন) ও ২০০১ সালের ফলাফল নিয়ে নিবিড় গবেষণা করছিলাম। আমাদের এই গবেষণাকর্মটি ভারতের কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি রাহুল গান্ধী কর্তৃক প্রশংসিত হয়। রাত বাড়ছে। আমি কোন কিছুই বুঝতে পারছি না। ঠিক রাত ৯:৫৫ মিনিটে ড. কামাল হোসেন সাহেব আসলেন আর তার ৫ মিনিট পরে এসে পৌঁছালেন আমাদের নেতা ডা. বি. চৌধুরী। এবার আমি বিপদটা টের পেলাম। ইতোমধ্যে হোটেল কস্তুরী থেকে ডিনার আনা হয়েছে। ডিনার শেষ হলে মাহী ভাই বললেন, 'ওয়াসিম ভাই, কাগজপত্র নিয়ে আপনি আসেন।' এই হলেন মাহী ভাই যিনি আমাকে একবারের জন্যও বলেননি কাদের সাথে আজ মিটিং। ড. কামাল হোসেন ও ডা. বি. চৌধুরী দুজনই নিজ নিজ ক্ষেত্রে দিগ্বিজয়ী সফল মানুষ। তাঁদের সম্পর্কে আপনারাও ভালভাবেই জানেন। মাহী ভাই আমাকে তাঁদের টেবিলে বসিয়ে দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন। আমি তখন বেশ অসুস্থ। কেননা আমার স্ট্রোক করেছে। বাম হাত ও বাম পা অকার্যকর। ডা. বি. চৌধুরী স্যার আমার অসুস্থতা সম্পর্কে ড. কামাল হোসেনকে সংক্ষেপে অবহিত করলেন। আমার তখন 'চিত্ত যেথা ভয় শূন্য' অবস্থা। আমার তখন পরিস্থিতি মোকাবেলা করা ছাড়া কিছু করার নেই। ড. কামাল হোসেনের সাথে এই প্রথম দেখা। বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবী ড. কামাল হোসেন আমাকে প্রশ্ন (জেরা) করা শুরু করলেন। অবিশ্বাস্য হলেও তিনি টানা পৌনে দুই ঘণ্টা প্রশ্ন করলেন। রাত ১১টা থেকে ১২:৪৫ মিনিট পর্যন্ত। আর আনন্দের বিষয় এই যে, এই দীর্ঘ সময়ে তিনি যত প্রশ্ন করেছিলেন তার শতভাগ উত্তর আমাদের গবেষণায় ছিল। তিনি আমাদের কাজে সন্তুষ্ট হলেন বলেই মনে হলো। এরকম এক ঘটনার সাক্ষী থাকলেন খ্যাতিমান চিকিৎসক, রাজনীতিবিদ ও সাবেক রাষ্ট্রপতি ডা. বি চৌধুরী স্যার।

ড. কামাল হোসেন ও ডা. বি. চৌধুরী'র নেতৃত্বে নতুন রাজনৈতিক ভাবনার সূচনা হয়। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন জেলায় জেলায় গণসংলাপ করবেন। বিএনপি-জামায়াত

শাসন আমলে বিষয়টি সহজ ছিল না। এই গণসংলাপ দেশে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। ময়মনসিংহ ও দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত গণসংলাপ হামলার শিকার হয়। সামনে জাতীয় নির্বাচন। তখন আমাদের মাঠ পর্যায়ে গবেষণার সিদ্ধান্ত হয়। গবেষণার অংশীদার গণফোরাম ও বিকল্পধারা বাংলাদেশ। বিকল্পধারা তখন বাংলাদেশের রাজনীতিতে সবচেয়ে আলোচিত নাম। সবার নজর বিকল্পধারার দিকে। ওই গবেষণায় গণফোরামের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কমান্ডার আব্দুর রউফের (রউফ ভাই) নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটা টিম বিকল্পধারার গবেষণা টিমের সাথে যুক্ত হন। মাহী বি. চৌধুরী তখন বিশেষভাবে আলোচিত একটি নাম। মাহী বি. চৌধুরীর নেতৃত্বে ওই গবেষণা পরিচালিত হয়। আমাদের সাথে থিং ট্যাংক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক জন শিক্ষক যুক্ত ছিলেন। আর আমি ছিলাম গবেষণাকর্মটি সমন্বয়ের দায়িত্বে। যার কারণে গণফোরামের টিমের সাথে আমার যোগাযোগটা বেশ কাছের ছিল। আমরা ২৯টি জাতীয় নির্বাচনী এলাকার ইউনিয়ন বেজ গবেষণা করেছিলাম। যাতে বুঝতে পারি ভোটারদের ভোট দেয়ার প্রবণতা কোন ইউনিয়নে কোন দলের প্রতি বেশি। কারণ ছিল ইউনিয়ন বেজ কর্ম-পরিকল্পনা ঠিক করা।

রউফ ভাই তাঁর টিম নিয়ে আসতেন। আমাকে ওয়াসিম বলেই ডাকতেন। আমিও বলতাম, জ্বি রউফ ভাই। এই সময় তিনি বা তাঁর দল কী ধরনের তথ্য চান সেসব আমাকে বলতেন। আমিও আমাদের গবেষণার বিষয়াদি তাঁকে অবহিত করতাম। বাস্তবতা ছিল, আমরা গবেষণাটি বৃহত্তর পরিসরে করার চেষ্টা করছিলাম। যার ফলে রউফ ভাইদের চাহিদার পূর্ণ প্রতিফলন ছিল আমাদের গবেষণায়। তিনি কখনই আমাদের কোন পরামর্শ দেয়ার প্রয়োজন মনে করেন নি। তাঁর এই গুণটি আমার খুব ভাল লেগেছিল। আমার ধারণা তাঁর জায়গায় অন্য কেউ থাকলে কিছু হলেও পাণ্ডিত্য দেখানোর চেষ্টা করতেন। তিনি কথা বলায় ছিলেন মিতব্যয়ী। আমি কখনো তাকে অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে শুনিনি। এমন কি আমরা যখন গণফোরামের সাথে মিটিং করতাম তখনও তাকে সুনির্দিষ্টভাবেই মতামত দিতে দেখেছি। তিনি শুনতে এবং উপলব্ধি করতে ভালোবাসতেন। যা একজন চিন্তাশীল মানুষ করে থাকেন। আর জীবন যাপনে অনাড়ম্বর তো ছিলেনই।

এক সময় আমাদের গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ শেষ হলো। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় গণফোরাম বা বিকল্পধারা জনমানুষের রাজনীতির কাছে

পৌঁছাতে পারে নি। বোঝা যায় বিএনপি-জামায়াত জোট তখনও যথেষ্ট শক্তিশালী অবস্থানে আছে। একদিন রউফ ভাই তাঁর টিম নিয়ে আসলেন। যথারীতি বললেন, 'ওয়াসিম, এখন আমাদের তথ্যগুলো দিয়ে দেন।' আমি মাহী ভাইয়ের অনুমতি নিয়ে ২৯টি নির্বাচনী এলাকার সমস্ত তথ্যের (ডাটা) হার্ড (প্রিন্ট) কপি তাঁকে হস্তান্তর করলাম। রউফ ভাই সেগুলো হাতে নিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেলেন। এতো বড় একটা গবেষণায় আমাদের প্রতি এতোটাই আস্থাশীল ছিলেন যে তাঁকে কখনো উদ্বিগ্ন হতে দেখিনি। তিনি ছিলেন মৌনতা ও ধৈর্যের সমন্বয়ে একজন চমৎকার মানুষ।

একবার মাহী ভাইয়ের সাথে ভৈরব গিয়েছিলাম কোন এক প্রোগ্রামে। সেখানে আমি রউফ ভাইয়ের অবস্থান বোঝার চেষ্টা করেছিলাম। বুঝেছিলাম ভৈরবের মানুষ তাকে কতটা ভালোবাসে। একজন মানুষও তাঁর নাম উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করেন নি। কমান্ডার আব্দুর রউফ ছিলেন ভৈরবের মানুষের কাছে গৌরবের ও ভালোবাসায় জড়ানো একজন নিকটতম মানুষ।

লেখক: কবি, লেখক ও গবেষক এবং দপ্তর সম্পাদক ও গবেষণা সমন্বয়ক, বিকল্পধারা বাংলাদেশ

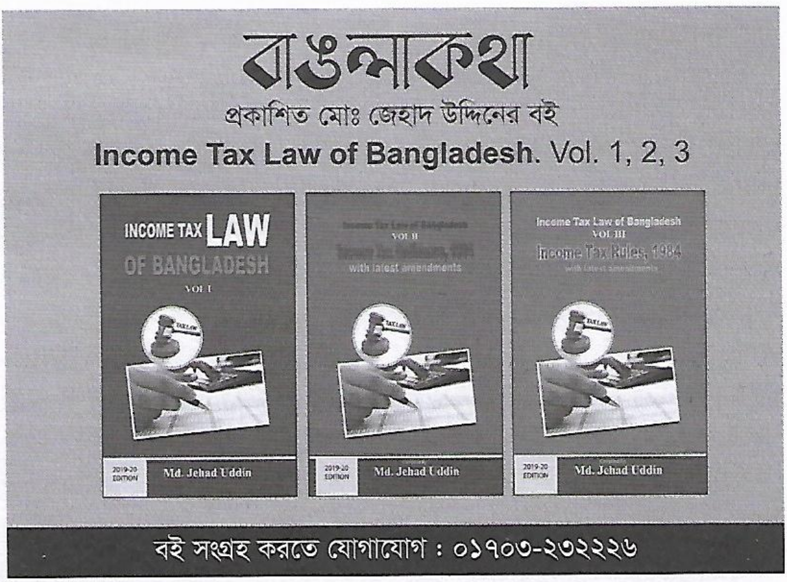

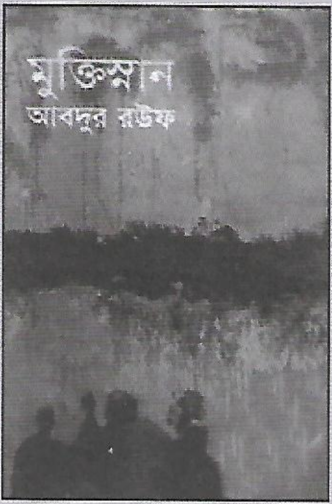

মুক্তিস্নান
আবদুর রউফ
মীরা প্রকাশন
প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০০৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি ২০০৮
প্রচ্ছদ: ধ্রুব এষ
পৃষ্ঠা: ২০৮
মূল্য: ৩০০.০০

মো. শরীফ হোসেন

আবদুর রউফের মুক্তিস্নান উপন্যাসে

মুক্তিযুদ্ধ ও মানবিক প্রেম

বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসে স্বাধীনতা অর্জন সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। কোনো স্বাধীন জাতির মুক্তির সংগ্রাম যখন সফল হয় তখন তা জাতীয় চেতনার মর্মমূলে থাকে নিরন্তর প্রবহমান। বিরাজ করে অনাগত কাল ধরে অনিবার্য প্রেরণার উৎস হয়ে। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাঙালি জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত রূপের বিকাশ ঘটে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের মাধ্যমেই। তাই মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গ বাংলা সাহিত্যে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। কিন্তু পাশাপাশি একথাও সত্য যে, মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গকে ব্যবহার করার মতো সাহিত্য সৃষ্টির যে বিরাট পটভূমি সৃষ্টি হয়েছিল তা উপলক্ষ করে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো সাহিত্য রচিত হয়নি আজো।

মুক্তিযুদ্ধের মতো একটি বিষয়কে চিহ্নিত করার জন্য উপন্যাস একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র। যদিও বাংলা সাহিত্যে এতদসংক্রান্ত কালজয়ী উপন্যাস রচিত হয়নি।

অবশ্য এর পেছনে যুদ্ধোত্তর কালে দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিই ঔপন্যাসিকের চেতনাকে ভিন্ন দিকে মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। এতদসত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গে সার্থক উপন্যাস যে রচিত হয়নি, তা কিন্তু নয়। শওকত ওসমান, আনোয়ার পাশা, রশীদ হায়দার, আমজাদ হোসেন, সেলিনা হোসেন, হুমায়ূন আহমেদ ও আনিসুল হকসহ বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন ঔপন্যাসিকের রচনায় মুক্তিযুদ্ধের চিত্র এসেছে স্বাভাবিকভাবেই। মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গে রচিত আবদুর রউফের মুক্তিস্নান উপন্যাসটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গে রচিত হলেও মানবিক প্রেমই মুখ্য বিষয় হয়ে ফুটে উঠেছে।

গোটা উনিশ ও বিশ শতকের মধ্যে সবচেয়ে উত্তাল সময় এই শতকের চল্লিশের দশকটি। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা ও দেশ বিভাগের মতো প্রলয়ংকরী ঘটনাবলি এই শতকেরই গর্ভজাত সন্তান। হাজার বছরের ইতিহাসে বাঙালি এতো বড় বিপর্যয়ের মধ্যে আর কখনো পড়েনি। তবে এতো বড় বিপর্যয়ের মধ্যেও এ সময়েই এ জাতির মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রত্যাশার জন্ম হয়েছিল– এ প্রত্যাশা স্বাধীন সার্বভৌম স্বদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। এই বিরাট মাপের প্রত্যাশা ও বিপর্যয় জাতীয় জীবনে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে উর্মিমুখর করে তুলছিল– একজন সময় ও সমাজ-সচেতন শিল্পীর পরিপূর্ণ দায়িত্ব ও নিষ্ঠা দিয়ে আবদুর রউফ তা ধারণ করে তা থেকেই সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপন্যাসের নায়ক আহমদ শফিকুর রহিমকে।

আহমদ শফিকুর রহিম এ উপন্যাসের নায়ক। তাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের সামগ্রিক ঘটনাটি আবর্তিত। সে পূর্ব বাংলার এক মধ্যবিত্ত গ্রাম্য তরুণ। শফিকের ছত্রছায়ায় লেখকের নিজস্ব জীবন অভিজ্ঞতার সূত্র ধরেই গতিময় হয়েছে এ উপন্যাসের মূল স্রোত। তাই বহু খণ্ডচিত্র ও চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে এতে। আর এ সমাবেশের মধ্য দিয়েই মূর্ত হয়ে উঠেছে বাঙালির স্বদেশ-চেতনা, শাশ্বত মানবিক প্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের অমর কাহিনি। সমাজ ও কাল-সচেতন অঙ্গীকারবদ্ধ মহৎ শিল্পীর নিখাদ নিষ্ঠা দিয়ে আবদুর রউফ দেশ-কাল ও জীবনকে এখানে মিলিয়ে দিয়েছেন একসঙ্গে। ২৫৫ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসটির পটভূমিকে প্রাণচঞ্চল করার প্রয়োজনে যেমন অসংখ্য চিত্র ও চরিত্র এসেছে, তেমনি এসেছে একই ঘটনা বা আদর্শকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার মন ও মানসিকতাসম্পন্ন পাত্রপাত্রী। আমাদের বাঙালি

মধ্যবিত্ত সমাজের চিরায়ত প্রথা পিতামাতা বা মুরুব্বিদের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা না করা কিন্তু মুক্তিস্নান উপন্যাসের নায়ক আহমদ শফিকুর রহিম এ প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করেছে। অপরিণত বয়সে তার বোন ফৌজিয়ার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার পিতা তাকে বিয়ে দিতে প্রস্তুতি নিলে শফিক সামনাসামনি পিতাকে বলেছিল, 'এতো অল্প বয়সে বিয়ে-শাদির চিন্তা না করে কলেজে ভর্তি করানোর কথাই ভাবা উচিত বলে আমরা মনে করি।' এরপর পিতার কাছ থেকে যে উত্তর এসেছিল তা শুনে শফিক বিভ্রান্ত ও বিমর্ষ হয়ে যায় কিন্তু বিক্ষুব্ধ হয় ভেতরে ভেতরে। পরবর্তী সময়ে তার মতের সপক্ষে পিতাকে দীর্ঘ চিঠি লেখে শফিক। এ পত্রের কী ফলোদয় হয়েছিল উপন্যাসটিতে তার উল্লেখ না থাকলেও কিছুদিনের মধ্যেই শফিক চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়।

শফিকের পিতা আবুল কাসেম তার চাচাতো সম্বন্ধী বাশার মুন্সির মেয়ে বিলকিস বানুর সঙ্গে শফিকের বিবাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলে। কিন্তু শফিক অবনত মস্তকে পিতার এ অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি। ফলে পিতার সাহায্য ও স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়। জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। জীবনের মোড় ঘোরে অন্যদিকে। মহৎ কোনো উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নের জন্য নয় অথবা মানুষ গড়ার কারিগর হওয়ার স্বপ্ন নিয়েও নয়, শুধুই কোনো রকমে বাঁচার জন্য শফিক প্রথমে চাকরি নেয় একটি স্কুল মাস্টারের। পরে একজন প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে ভর্তি হয় ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে। এখানেই শফিক সাক্ষাৎ পায় ইশরাতের। জীবনের এই ঘূর্ণাবর্তে তাকে সাহস জোগায় শক্তি জোগায় হাসান, আর নিবু নিবু প্রদীপ শিখার মতো হৃদয় গভীরে ক্ষীণ আশার আলো জ্বালিয়েছে অবাঙালি মায়ের কন্যা ইশরাত। এক কথায় বলা যায়, ইশরাতই এই উপন্যাসের প্রাণ-প্রদীপ। শফিক আর ইশরাতের প্রেম বড়ই উজ্জ্বল, বড়ই নিখাদ। আর অম্ল মধুর রসে প্রবহমান শীতল ধারা। এতে নেই ছলাকলা, আছে সংবৃত জাত্যভিমান। কিন্তু এ সংবৃত আবেগ নিয়েই সে কেড়ে নেয় পাঠকের মনোযোগ। প্রেম নামক সূর্যের আলোর নিচে আমরা ধীরে ধীরে বিকশিত হতে দেখি একটা নারীকে– সদেহবন্দী ভোগোন্মত্ততার বিবর থেকে নয়, ধর্ম আর জাত্যভিমানের ভেতর থেকেই মানবতার উদার বেদীতে ঘটে যায় নিঃশঙ্ক আত্মপ্রসারণ। এই আত্মপ্রসারণ তাকে যতখানি উদ্বুদ্ধ করেছিল আত্মাহুতিতে, তার চেয়ে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করেছিল আত্মনিবেদনে। এই প্রসারণ আর সংকোচনের কাটাকুটিতে এবং স্বাধীনতা

নামক প্রাচীরের আড়ালে হারিয়ে গেল যে প্রাণের দ্যুতি তা পাঠকের হৃদয়ে বেদনার বেহাগ বাজায় অনেকক্ষণ ধরে। ইশরাত যেন কয়লার খনি থেকে তোলা হীরা। বাঙালি-অবাঙালির দ্বন্দ্বের ভেতর এ অবাঙালি মেয়েটিকেই ঔপন্যাসিক গৌরবের উজ্জ্বল মুকুট পরিয়ে যেন তার সব কল্পনাকে তিনি সহনীয়তার আবরণে ঢেকে দিয়েছেন। এ যেন তার অচিন্তনীয় অপূর্ব সৃষ্টি। কী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, কী মননশক্তি, কী বুদ্ধিবৃত্তির আলোক, আর কী সুদক্ষ শিল্পী মন, লেখক যেন এসব একত্রে ঢেলে তার সংবেদনশীল মনের সহানুভূতির জারকরসে সিক্ত করে এ অপূর্ব নারীকে রূপ দিয়েছেন।

আশা-নিরাশা, পাওয়া না পাওয়া, আবার পেয়ে হারানো– সব মিলে ইশরাত শফিকের স্নেহ-বঞ্চিত জীবনকে আন্দোলিত করেছে বারবার। শফিকের সারা অস্তিত্ব জুড়ে বিরাজিত ইশরাত কিন্তু দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার প্রাক্কালে চলে যায় দেশ ছেড়ে। ভেঙে যায় শফিকের ঘর বাঁধার স্বপ্ন। আসলে এখানেই লেখকের বিশেষত্ব। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা, এ স্বাধীনতার মাধ্যমে আমাদের অনেক পাওয়ার আশা ছিল, স্বপ্ন ছিল। এ জাতি স্বাধীনতা লাভ করেছে সত্য, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘদিন পরও জাতি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। শফিক আর ইশরাতের ভেতর দিয়ে লেখক যেন আমাদেরকে সে আশাভঙ্গেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

লেখক তার নিজের জীবনদর্শন ও জীবানুভূতির বাস্তবচিত্র তুলে ধরতে গিয়ে অনেক ঘটনার, অনেক কাহিনির জন্ম দিয়েছেন, তাই সঙ্গত কারণেই এ উপন্যাসটিতে অনেক চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। উপন্যাসটিতে বর্ণিত ঘটনাবলির মধ্যে বিশেষভাবে এসেছে কলকাতা ছেড়ে আসা এক মধ্যবিত্ত শহুরে তরুণীর গল্প, বিমানবাহিনীর এক সার্জেন্ট ও তার স্ত্রীর মুক্তিযুদ্ধের গল্প, পূর্ববাংলা মোহাজের সমিতির এক আদর্শবাদী তরুণ তার রাব্বানিয়াতের গল্প, এক সাবেক ছাত্রনেতা ও তার স্ত্রীর মুক্তিযুদ্ধের গল্প। উপন্যাসটির অনেকগুলো অপ্রধান ও প্রধান চরিত্রের মধ্যে হাসান মাহমুদ একটি অন্যতম প্রধান চরিত্র, উপন্যাসটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যার অবস্থান। এ চরিত্রটির মাধ্যমেই লেখক মধ্যবিত্ত দুর্বিষহ জীবন-যন্ত্রণার চিত্র অঙ্কনের প্রয়াস পেয়েছেন। ছাত্রলীগের সাবেক নেতা শফিকের আপন খালাতো ভাই খন্দকার হাসান মাহমুদ বিত্তবান, স্বাস্থ্যবান। হৃদয়বান ও পরোপকারী মানুষটি তার জীবনের সমুদয় শ্রম, চিন্তা ও পরিশেষে তার

জীবন দান করেছেন দেশের জন্য। কায়েদে আযম কলেজের বিহারি কয়েকজন ছাত্র ও মাউরা অধ্যক্ষ ফাতেমীর ষড়যন্ত্রে ১৯৬৫ সালের বিএ পরীক্ষার সময়ে হাসান নকল করার অপরাধে বহিষ্কৃত হয়। এতে রুষ্ট হয় তার পিতা। অতঃপর হাসান নিজের পায়ে দাঁড়ানোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে ঢাকায় কাজের সন্ধান করতে থাকে। সে দুর্দিনে এম আর খান তাকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তারই সহায়তায় হাসান মাহমুদের বিয়ে হয় রওশন বানুর সঙ্গে। পরবর্তী সময়ে রওশন বানুই উপন্যাসটির আদর্শ নারী চরিত্র হিসেবে বিকশিত হয়ে ওঠে। তারই সংসারে স্থান দেয় শফিককে এবং মাহফুজা ও নিয়ামুল গফুরকে। নারীর মমতা দিয়ে রক্তের সম্পর্কহীন ভিন্নমতাবলম্বীদের নিয়ে গড়ে তোলেন সুখের যৌথ সংসার। পরমতসহিষ্ণু হলে ভিন্ন মতাবলম্বীদের নিয়েও যে একই ছাদের নিচে শান্তিতে বসবাস করা যায় তাই রুশন ও হাসান মাহমুদের সংসার যাত্রার উদাহরণের মাধ্যমে লেখক বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন। নিজের ক্যান্সার হয়েছে জেনেও রওশন বানু সাহসে বুক বেঁধেছে নিজের জন্য নয়, একটি সুস্থ সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য। পরম করুণাময়ের অশেষ রহমতে রওশন বানু একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়, যার নাম রাখা হয় 'মুক্তি'।

সময়ের প্রয়োজনে রওশন বানুর সুখের সংসারের দুইজন সদস্য শফিক ও নিয়ামুল গফুর যোগদান করেন মুক্তিযুদ্ধে আর হাসান মাহমুদ যার ধারণা ও বিশ্বাস ছিল আমেরিকার সহায়তায় বাঙালিরা তাদের অধিকার আদায় করতে সক্ষম হবে, তিনিও শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান শাসকচক্রের চক্রান্ত বুঝতে পেরে নিজ এলাকায় এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে বীরের মতো শহীদ হয়। বীর পুত্রের মৃত্যুতে পিতার বুক শোকে কেঁপে উঠেছে। পিতা খন্দকার লাল মাহমুদ খাটিয়ার ওপর যত্ন করে শোওয়ানো ধবধবে লাল চাদরে ঢাকা পুত্রের মুখটা চাদর তুলে দীর্ঘক্ষণ দেখলেন, অতঃপর তেমনি নীরবে চাদর দিয়ে মুখটা ঢেকে কোনো দিকে দৃষ্টিপাত না করে অবলীলায় হেঁটে চলে গেলেন বাড়ির সামনের মসজিদে।

রোগাক্রান্ত রওশন বানু স্বামীর মৃত্যুতে আর্তনাদ করে ওঠেনি, শোক হৃদয়ে চাপা দিয়ে সবাইকে বলতে বলেছে, 'যারা আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গ করেন তাদেরকে মৃত বলো না।' এমনি শত দুঃখের স্মৃতি নিয়ে মহৎ প্রেরণা হয়ে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সৃষ্টি সীমায়– আমাদের মুক্তিযুদ্ধ।

ঔপন্যাসিক আবদুর রউফ তাঁর জীবন থেকেই সংগ্রহ করেছেন উপন্যাসটির উপকরণ। তাই তাঁর চোখে দেখা মুক্তিযুদ্ধ, নিজের জীবনের ঘটনা, স্থানীয় মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা এবং কিছু বিতর্কিত বিষয়ও এতে স্থান দিয়েছেন। পাঠক সমাজ এসব বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে একজন নগণ্য পাঠক হিসেবে আমার ব্যক্তিগত অভিমত যে, অনেক চরিত্রের ভিড়ে উপন্যাসের কমান্ডার আবদুর রউফ চরিত্রটি একান্তই দুর্বল ও নিষ্প্রভ। শুধু উপন্যাসের ঘটনাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার জন্যই সম্ভবত তিনি এ চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন। শফিক যেখানে লেখকের 'মানসপুত্র' সে ক্ষেত্রে কমান্ডার আবদুর রউফ চরিত্রটি প্রশ্নবিদ্ধ কিনা তা নিশ্চয় বিবেচ্য বিষয়।

অধিকার আদায়ের সংগ্রাম, যুদ্ধ, প্রতিরোধ যুদ্ধ চিরকালই মহৎ সাহিত্যের এক অনন্য উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, মানুষ তার আপন অস্তিত্বের প্রয়োজনেই যুদ্ধ করে। যুদ্ধ যেহেতু মানব সমাজের সংকটের গভীরতাকে উন্মুক্ত করে দেয়, পক্ষ-প্রতিপক্ষের সীমারেখাকে একটি সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠা করে, অথচ এই জটিল ও সংবেদনশীল সময়কালেই হয়তো তাই মানুষের মহত্ত্বেরও গভীরতার পরিচয় হয়ে ওঠে উদ্ভাসিত। স্বাধীনতার যুদ্ধ আমাদের ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে এক অত্যুজ্জ্বল সঞ্চয়, যে সঞ্চয় অসংখ্য মানুষের রক্তে রঞ্জিত। সে সঞ্চয় অজস্র প্রাণের নীরব ও অসম্ভব আত্মদানে উজ্জ্বল, আর এই সঞ্চয়কে উপজীব্য করেই আবদুর রউফ যে উপন্যাসটি রচনা করেছেন তা এতটা শিল্পোত্তীর্ণ না হলেও কালের সাক্ষী ও ইতিহাসের আলোকসম্পদ হিসেবে চিরদিন থেকে যাবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

দৈনিক ভোরের কাগজ
মে ২০০৮

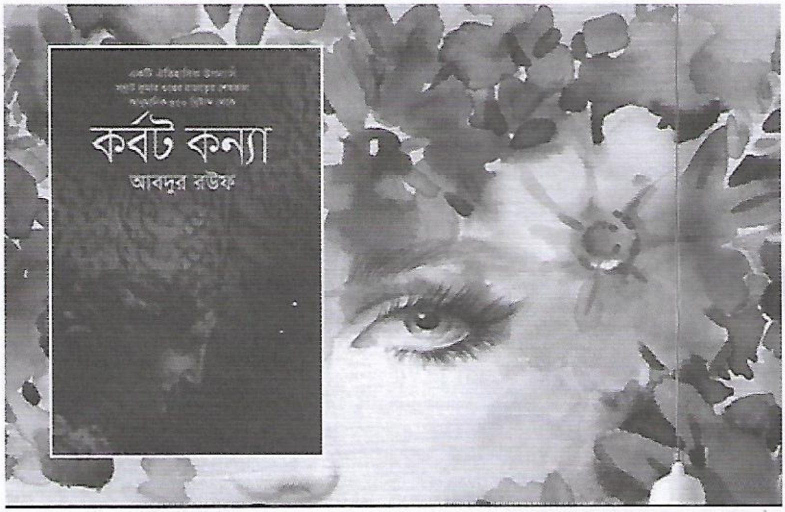

উপন্যাসে ইতিহাস

মো. শরীফ হোসেন

কমান্ডার (অব.) আবদুর রউফ একাধারে একজন লেখক, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তিনি অভিজ্ঞ। ছাত্রজীবনে পড়াশোনা করেছেন ইতিহাস নিয়ে। তাই ইতিহাস বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে আগ্রহী। তাঁর সবকটি উপন্যাসই ইতিহাসের উপাদানে গড়া। কুমার গুপ্তের রাজত্বকালের শেষ পর্যায়ে আনুমানিক ৪৫০ খ্রি. থেকে আট দশ বছর কাল ব্যাপ্ত সময়ের গুপ্ত সাম্রাজ্যের বহিঃপ্রান্তীয় দেশ সম্ভার রাজ্য এবং তার অন্তর্গত মধুপুর, ভাওয়াল, শিবপুর পলাশতলী, পঞ্চবটি ও বন্দর নগরী ঢাকা অঞ্চলসমূহের বিক্ষত মানুষের মর্মজ্বালা এবং একই সাথে সংগ্রামী মানুষের জীবনযুদ্ধ ও বিজয় গাঁথার নিপুণ চিত্র এঁকেছেন তাঁর কর্বট কন্যা উপন্যাসের মাধ্যমে। উপন্যাসটিতে বিদ্রোহমুখর অতীতের ক্ষুব্ধ সময়ের বিস্তৃত সীমায় জীবনের বিকাশ, বিলাস ও বিনাশকে চিত্রিত করেছেন। উপন্যাসের বিষয়বস্তু দূর অতীতের হলেও আধুনিক জীবনকে স্পর্শ করেছে তার শৈল্পিক বিন্যাস। বৃহত্তর জীবনবোধের বহু আলেখ্য, বিভিন্ন ঘটনা, পরিবেশ ও চরিত্রের অনুষঙ্গ বর্ণিত হয়েছে কর্বট কন্যা উপন্যাসটিতে। লেখক তাঁর উপন্যাসটির পরিকথনে উল্লেখ করেছেন, 'বহুদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রতি আর্যমানসের একটা উন্নাসিকতা, ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাব সক্রিয় ছিল।

বাংলার আদিম কৌমবদ্ধ মানব সমাজ বহুদিন পর্যন্ত আর্যধর্ম-সংস্কৃতির সক্রিয় বিরোধিতা করেছে; বোঝাপড়া করে একটা সমন্বয় গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছে। এই বোঝাপড়ার ফলশ্রুতিতে বৈদিকযুগ, বৌদ্ধযুগ অতিক্রম করে হিন্দুযুগে আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির চূড়ান্তরূপ হিসেবে প্রচলিত হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, আর্য-ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম, জন্মান্তরবাদ ও ধর্ম সংস্কৃতির বিজয়াভিযান বিনা প্রতিরোধ ও বিনা সংঘর্ষে সম্পন্ন হয় নি। সেই সংঘাত, সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অব্যাহত সংগ্রামে আমাদের পূর্বপুরুষের বিশ্বাস ও ঐতিহ্যকে লালন করার ঐকান্তিক নিষ্ঠায় নিম্নকোটি মানুষের যে অদম্য প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে 'কর্বট কন্যা।' শবর, ডোম, চণ্ডাল, মল্ল, রাজবংশী, কোচ কর্বট প্রভৃতি নিম্নবর্ণের মানুষজন সংগ্রাম করেছে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে। সেহেতু তাদের প্রতিপক্ষ ছিল অর্থ, অস্ত্র, কৌশল ও রাজ আনুগত্যে সমৃদ্ধ, তাই চূড়ান্ত বিজয় তারা আয়ত্ত করতে পারেনি।

উপন্যাসটির প্রাণশক্তি কর্বটবংশীয় শুকদেবের কন্যা মায়াবতী। শ্রেণী ও বর্ণবৈষম্য পীড়িত নিম্নবর্ণের সাধারণ মানুষ ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীলদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে এবং এই বিদ্রোহী শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে উপন্যাসটিতে আবির্ভূত হয়েছে মায়াবতী। তার জীবনের শ্রম ও চিন্তাকে ব্যয় করেছে তার সম্প্রদায়ের স্বার্থে। তৎকালীন সমাজের প্রথাভিত্তিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে সহযোদ্ধাদের পাশে থেকেছে বৃহত্তর সংগ্রামকে কার্যকর করার প্রত্যাশায়। তাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের ঘটনাক্রম আবর্তিত হয়েছে।

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস থেকে জানা যায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানের পর পূর্ব বা তৎকালীন বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম ও পশ্চিম অঞ্চলে কিছু কিছু আর্য উপনিবেশ বা শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও অতি প্রাচীনকাল হতেই অস্ট্রিক, দ্রাবিড় এবং মোঙ্গলীয় জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত পৃথক ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি ও বলিষ্ঠ জাতি-চেতনাবোধ বিদ্যমান ছিল। আর সে জন্যেই আর্যদের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি তৎকালীন প্রাচ্য বা পূর্বদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহে সমাজ-জীবন ও রাষ্ট্রজীবন ক্ষতবিক্ষত হয় এবং চরম অশান্তিতে ভরপুর হয়ে ওঠে। বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত বিজাতীয় আর্যসমাজের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রাচ্য ও পূর্বদেশীয় সমাজ তীব্র প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে।

ফলে, আর্য ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিপরীতে এ অঞ্চলে জৈনধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। অনুমেয় যে, ঐ দ্বন্দ্বমুখর পরিস্থিতির ভাষাচিত্রই কর্বট কন্যা উপন্যাস। ব্রাহ্মণদের আনুষ্ঠানিক যাগযজ্ঞ ও জটিল মতবাদের প্রতিবাদ করেছে শবর, ডোম, চণ্ডাল, মল্ল, রাজবংশী কোচসহ সকল আদি বনবাসী জনগোষ্ঠী। উপন্যাসটিতে এদেরই প্রতিনিধি ইসিদাসী, মায়াবতী, লহনা, কলিঙ্গা, হিঙ্গল, নীলাভ্র ভিক্ষু, উদয়মান ও কোচপুত্র অর্কদাস। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রতিনিধি শিবপুরের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পুলিন ভট্ট, রুহীদত্ত, পুষধ্রঘোষ, মনোহর নাগ প্রমুখ।

লেখক তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তখন থেকে সহস্র বর্ষ (প্রায় আড়াই হাজার বছর) পূর্বে কুরুপাঞ্চালের তরুণ রাজা প্রবাহণ জৈবলি উদ্ভাবন করেছেন ব্রহ্মের ধারণা। ইতিপূর্বে সকল দেবতা ছিল সাকার কিন্তু তখনও তাদেরকে কেউ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে নি। তাদের সংখ্যাও ছিল বহু এবং জীবনাচার ছিল মানবকূলের অনুরূপ। সুতরাং তাদের অস্তিত্বকে বিশ্বাসভাজন করতে করতে ব্রাহ্মণ পুরোহিত যতই যাগযজ্ঞ করুক, যতই অর্থব্যয় করুক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমানেরা সন্দেহ করতে শুরু করে। অনেকেই অতি চার্বাকের মতামতে বিশ্বাস স্থাপন করতে থাকে। এ অবস্থায় নিজ রাজ্যে শাসনব্যবস্থাকে নিরুপদ্রব করার লক্ষ্যে রাজা প্রবাহণ সৃষ্টি করেন সকল দেবতার স্রষ্টা ব্রহ্মাকে। ব্রহ্মা আবার নিরাকার– সর্বত্র বিরাজমান, আদি এবং একক। ব্রহ্মার সাথে তিনি আবার যুক্ত করেন কর্মফলভিত্তিক জন্মান্তরবাদ। স্বর্গে গিয়ে কেউ মৃত জীবকে সুখভোগ করতে দেখে নি। কিন্তু পুনর্জন্মবাদী তত্ত্বের ভিত্তিতে এ জগতে উঁচু-নিচু, ছোট বড়, ধনী-নির্ধনের যে প্রভেদ তা হল পূর্বজন্মের কর্মফল। এ জগতে জীবন্ত মানুষ তার দৃষ্টান্ত। সুতরাং ব্রাহ্মণ ও রাজন্যকে মান্য করো, শাস্ত্রের বিধান মেনে চলো, পরজন্মে উন্নত পর্যায়ে জন্ম নেবে। ব্রাহ্মণ্যবাদী-দের মতে, দেবতা ব্রহ্মার মস্তক থেকে উদ্‌ভুত উচ্চতম বর্ণ ব্রাহ্মণ যার কাজ শাস্ত্রীয় বিধান দান ও যাগযজ্ঞে পৌরহিত্য করা, বাহু থেকে উদ্ভব ক্ষত্রিয় যার দায়িত্ব যুদ্ধাস্ত্র ধারণ ও প্রজাশাসন। প্রজাকূলের কোন ব্যক্তি যদি চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা অবনত মস্তকে মেনে না নেয় কিংবা কোন কারণে ব্রাহ্মণের সন্তুষ্টি অর্জন করতে ব্যর্থ হয় তা হলে ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ তার কথিত পূতপবিত্র পৈতা স্পর্শ করে অভিসম্পাৎ দিলে অচিরেই বাস্তবে তা কার্যকর হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণের ইঙ্গিতে নিয়োজিত অস্ত্রধারী উগ্র পুরুষ ঘাতক সে অভিসম্পাৎ সকলের অলক্ষ্যে কার্যকর করে দিত। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা শাস্ত্রকে ব্যবহার করে নিম্নবর্ণের সাধারণ মানুষকে নির্যাতন করত, শোষণ-শাসন করত। সাধারণ মানুষদের জন্য ধর্মকর্মের জ্ঞান, শিক্ষা কিংবা উন্নত

জীবনে পদার্পণের কোন সুযোগই ছিল না। এ অন্যায্য কর্মব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল মায়াবতী, উদয়মান, হিঙ্গল, অর্কদাস প্রমুখ। তাদের প্রেরণাদাতা গুরু ভবদেব, যার মতে বর্ণ-গোত্র, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানব সন্তানের পূর্ণ আত্মমর্যাদা নিয়ে জীবন যাপন করার অধিকার আছে। সুতরাং জ্ঞানের দ্বার সকলের জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত করে দিতে হবে। উন্মুক্ত করে দিতে হবে তপস্যার দ্বার এবং কর্মের দ্বার। অনার্যকুলজাত দগ্ধকাষ্ঠবৎ ঘনকৃষ্ণ গাত্রবর্ণের এই মানুষটির মতে জীবন আনন্দের। আনন্দে জীবন-যাপন, আনন্দে মৃত্যু, পুনর্জন্ম আনন্দেরই অন্তপ্রবাহ। আনন্দ স্বর্গ, আনন্দই ঈশ্বর। আমরা ধরে নিতে পারি, গুরু ভবদেবের চরিত্রে লীন হয়ে আছে লেখক আবদুর রউফের ব্যক্তি জীবনের বিপুলায়তনিক বোধ, বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা, কিন্তু সে অভিজ্ঞতা সমাজ-বিচ্ছিন্ন কোন সত্তার আত্মকুণ্ডয়নে সমাধিস্থ নয়; বরং তা সম্প্রসারিত আমাদের সামাজিক ইতিহাসের বিপুল বিস্তারে। মায়াবতী ঔপন্যাসিকের মানস কন্যা। তার সাহসিকতা, ঔদার্য, জ্ঞানলাভের গভীর অনুরাগ ও আত্মপ্রত্যয় যেন আধুনিক জাগ্রত নারীরই প্রতিরূপ। দেড় হাজার বছর আগের নারীর জীবন চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না, ছিল না বাধাবন্ধনহীন। মগধ ও মৌর্য-যুগে পরিবারের প্রধান রূপ ছিল একান্তই পিতৃশাসিত যৌথ পরিবার। সমাজে স্ত্রীলোকের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। শৈশবকালে নারীকে সম্পূর্ণত পিতার কর্তৃত্বাধীন বলে গণ্য করা হতো, যৌবনে তিনি হতেন স্বামীর অধীন এবং স্বামীর মৃত্যুর পর হয়ে পড়তেন তিনি পুত্রদের অধীন। মনুসংহিতায় এই বিধান দেয়া হয়েছে যে, স্বামী সম্পূর্ণ গুণহীন হলেও তাকে দেবতা বলে গণ্য করতে হবে স্ত্রীকে। প্রচলিত প্রথা অনুসারে স্ত্রীকে হতে হতো স্বামীর সমবর্ণভুক্ত। ঔপন্যাসিক উপন্যাসটিতে যে সময়ের সমাজ বিকাশের বিষয় তুলে ধরেছেন সে সময়ে সমাজে নারীদের কথা বলার স্বাধীনতা ছিল না মোটেও। সুতরাং সে সময়ে দুর্দান্ত ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি নারীর প্রতিবাদ করার বাস্তবতা সন্দেহাতীত নয়। আসলে ঔপন্যাসিক একবিংশ শতাব্দীর নারী জাগরণের দীপ্তিতে পঞ্চম শতাব্দীতে প্রত্যক্ষ করেছেন। সাহিত্যের শৈল্পিক কৌশলে তিনি সাজিয়েছেন তাঁর মানসকন্যাকে। এই মায়াবতীর জীবনদীপ্তি আজকের সমাজের নির্যাতিতা, নিগৃহীতা নারীকে পথ দেখাবে এতে কোন সন্দেহ নেই। অন্যান্য নারী চরিত্রের মধ্যে ভাগ্যবিড়ম্বনা আর ত্যাগের মহান আদর্শ অত্যুজ্জ্বল হয়ে আছে ইসিদাসীর চরিত্র।

উদয়মান চরিত্রটি ঔপন্যাসিকের এক অনবদ্য সৃষ্টি। পশ্চিমাঞ্চল থেকে আগত আর্যকুলোদ্ভব মনুসংহিতার কঠোর সমালোচক সে; রীতিদ্রোহী এবং সাহসী।

সে বক্তব্য দেয় ধীর স্থির লয়ে, কিন্তু দৃঢ়তার সাথে। তার জ্ঞানের বিস্তার অনেক। বহু শাস্ত্রকার পণ্ডিতের উদ্ধৃতি দিয়ে সে যুক্তি বিস্তার করে। এই নিরহঙ্কারী জ্ঞানী ও সুদর্শন যুবকের প্রতি কেমন যেন আকর্ষণ বোধ করে মায়াবতী। তাকে শিবঠাকুর জ্ঞানে তার সাথে নৃত্য করেছে, দীঘির জলে অবগাহন করেছে পরম আনন্দে। কত পল, কত দণ্ড ও কত প্রহর অতিক্রান্ত হয়েছে– উদয়মান জানে না, জানে না মায়াবতীও। এক সময় দৃশ্যমান হলো উদয়মান দীঘির জল থেকে উঠে আসছে– এলায়িত মায়াবতীকে পাঁজাকোলে করে। মায়াবতী তার কোলে। সিক্ত কুন্তলরাজি, স্খলিতবসন। সমগ্র দেহ নিংড়ে জল পড়ছে পদপ্রান্তে। আবার কোচপুত্র অর্কদাসের প্রতিও মায়াবতীর ভালবাসার কমতি ছিল না। প্রদোষ দেবের দুঃসাহসী রক্ষীপ্রধান অভয় চোকের পুত্র অর্কদাস শিবপুর বীথির গুল্মিক রক্ষীদের অস্ত্রাঘাতে নিহত পিতার সাহসী পুত্র এখন প্রদোষ দেবের রক্ষীবাহিনীর অগ্রসৈনিক। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে সদাপ্রস্তুত। ব্রাহ্মণবিদ্বেষী। তাদের নিপীড়নের কথা মনে হলেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে, চক্ষু বিস্ফারিত হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়। সেও মায়াবতীকে ভালবাসে। প্রসঙ্গক্রমে একদিন অর্কদাস মায়াবতীকে বলেছিল, 'দেখে নিও মায়াবতী, আমি এদের একজনকেও ছাড়ব না। কেবল তুমি আমার পাশে থেকো, বলতে বলতে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো কান্নায়।' লেখক তাদের নিখাদ প্রেমের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন এভাবে, 'সে দিন সেই নির্জন দ্বি-প্রহরে উদ্দাত যৌবন এক তরুণ ও উদ্ভিন্ন যৌবনা এক তরুণী কতক্ষণ গভীর আশ্লেষে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের হৃদয়ে কী রূপ কম্পন সৃষ্টি হয়েছিল, কিংবা মনে স্বপ্ন রচিত হয়েছিল কী না তা কে-ই বা জানবে।' এ দ্বি-ঘাত প্রেমের দ্বন্দ্বের ঔপন্যাসিক কী ভাবে পরিসমাপ্তি টেনেছেন– তার বিচারের ভার কৌতূহলী পাঠকের হাতে ছেড়ে দিলাম।

আমরা জানি, উপন্যাসে সমাজ নয়, ব্যক্তিই পালন করে মুখ্যভূমিকা। ব্যক্তির আশা-নিরাশা ও কর্মময়তার মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে সমাজ-দর্শনের মৌল বৈশিষ্ট্যগুলো, যার সঞ্জীবনী স্পর্শে শতদলের মতো ফুটে ওঠে চলিষ্ণু সময় এবং আর্থ-রাজনৈতিক ও সাস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বহুবিধ গতি-প্রকৃতি। সর্বোপরি থাকতে হয় হৃদয়ের সেই অনিঃশেষ স্রোতধারা, প্রেমবাৎসল্য অথবা আত্মদহনের পথ ধরে যা হতে থাকে স্বতঃউৎসারিত। বলাবাহুল্য উদয়মানের ছত্রছায়ায় আবদুর রউফ আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছেন সেই বাড়ির যিনি জনবিচ্ছিন্ন সত্তার আত্মকুণ্ডয়নে নয়, আত্মপ্রসারণের অঙ্গীকারে একনিষ্ঠ থেকে তুলে

ধরেছেন একটি যুগের অবিনাশী আবর্তনকে। তুলে ধরেছেন আমাদের পূর্বপুরুষদের একটি উত্তপ্ত দশকের গ্লানি, গর্ব ও আশা নিরাশার ইতিহাসকে। আর্য হলেও সে যুবক অনার্যদের পাশে দাঁড়িয়েছে, ত্যাগের মহান আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সুখের সংসার ছেড়ে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে ভিক্ষুর বেশ ধারণ করেছে। ভিক্ষুর ত্যাগ, ইন্দ্রিয়সংযম, কামনার বিলোপ এবং নির্বাণ এ সকলই জীবনের মঙ্গলের নিমিত্ত বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছে। নারী সৌন্দর্যে মোহাবিষ্ট না হয়ে, ভোগ-উন্মত্ততার বিবর থেকে বেরিয়ে এসে মায়াবতীর পাশে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েছে তাদের পাশে যারা শবর, মল্ল, রাজবংশী, অহোম, কর্বট, কোচ, কৃষিজীবী, বনবাসী। যারা মনে করে শিবই তাদের পরম পিতা এবং যারা শিবের কাছে চায় এই পৃথিবীতে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার অফুরন্ত প্রাণশক্তি।

বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় বিভাসিত স্বপ্ন ও দীর্ঘ কলেবরে অনেক আকর্ষণীয় চরিত্র এ উপন্যাসে দৃশ্যমান হলেও চরিত্রই এর একমাত্র কিংবা প্রধান আকর্ষণ নয়। এখানে চরিত্র সৃষ্টিতে ঔপন্যাসিকের মন ও মনোযোগ যতটা না নিয়োজিত, তার চেয়ে অনেক বেশী সচেষ্ট একটা বিধ্বস্ত সময়ের চিত্র তুলে ধরার। একটা যুগের সামাজিক বিবর্তন তুলে ধরার জন্যে সে সময়ের ধর্ম, আর্থ-রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন, ফলে সংগত কারণেই উপন্যাসটিতে অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। এর ভাষা শৈল্পিক ও সমকালীন জীবনাচরণ বর্ণনার উপযোগী, তবে তৎসম শব্দের বহুলতা এর চলিত রীতির গতিময়তাকে কিছুটা ব্যাহত করেছে। ভৌগোলিক পরিবেশ ও নদ-নদীর কিছু পরিচিতি এবং বটেশ্বরে আবিষ্কৃত তৎসময়ের নিদর্শনাদির কিছু বিবরণ প্রসঙ্গক্রমে থাকলে বিষয়টি আরও প্রাসঙ্গিক হতো।

পরিশেষে, একথা বলা যায় আর্যরা এদেশে আসার আগেও ভারতবর্ষে জনবসতি ছিল। তারা ছিল অনার্য। যে আদি ভারতবাসীর দেবতা শিব, যিনি আনন্দের দেবতা। শিবভক্তদের প্রধান ধর্ম কৃষিকর্ম। ভূমিতে আমরা বাস করি, যে ভূমি কর্ষণ করে আমরা খাদ্য আহরণ করি, সে ভূমি আমাদের মাতৃতুল্য। অতএব, মায়ের কোল-নিবাসী সকল মানুষকে সহোদর সম ভালবাসতে হবে। দৃঢ়হস্তে পরস্পরকে ধারণ করে আনন্দের মধ্যে বাঁচতে হবে। এ জীবন আনন্দের, এ শিক্ষা অনার্যের শিক্ষা। এ দেশের আদি আদিবাসীরা অনার্য ছিল এবং এ সব নিম্নবর্গের মানুষজনই আমাদের পূর্বপুরুষ। শিকড় সন্ধানীদের কাছে এ গ্রন্থটি মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

নিবেদিত কবিতা

কমান্ডার আবদুর রউফ

মো. জেহাদ উদ্দিন

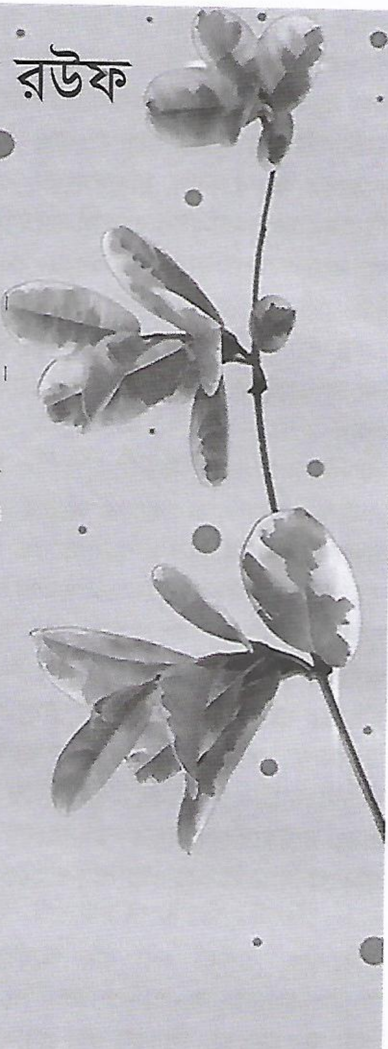

ঐ দেখ ঐ হাসে ভৈরব হরষে-
জন্মিল বুকে তার কোন দেব শিশু সে!
আর দশজন থেকে সে একদম আলাদা
দ্যুতি তাঁর লেগে আছে চোখে মুখে সর্বদা।
মেঘনার কূল ঘেঁষে কাটে তাঁর সারাবেলা
বইখাতা নিয়ে সেথা ভাসায় পাতার ভেলা।
নদী ও স্রোতের মত গতিময় জীবনের
ছবি এঁকে বয়ে যায় কত শত স্বপনের।
জরা বাধা কোনকিছু আটকাতে নাহি পারে
ছুটে যান তিনি শুধু আলোকের অভিসারে।
ব্রিটিশের গোলামী পাকিদের অনাচার
রুখে দিতে তিনি যেন নবযুগ-রাহবার।
পাঞ্জেরি-সম তিনি ছুটে যান নদী জলে
ঘুমের পাড়ারা সব জেগে ওঠে কলরোলে।
বাংলার আশা তিনি দরিয়ার সাদা ঘোড়া
ছুটছেন দিন রাত খ্যাতি তাঁর দেশজোড়া।
এরি মাঝে মুজিবের আহ্বান শুনে তিনি
রুখে দিতে চান যত পরাধীনতার গ্লানি।
মুজিবের হাতে হাত রেখে নৌ সর্দার
বলিলেন, 'আমি শুধু বাংলার কমান্ডার।
দেশ মাতা মুক্তির সংগ্রাম চলবে
বাংলার রণতরী নৌপথে চলবে।'
পাকিদের হাতে এই সংগ্রামী রণবীর
গ্রেফতার হয়ে তবু নত নাহি করে শির।
আসামি হলেন তিনি আগরতলা মামলার
বাংলার গৌরব আব্দুর রউফ নৌ কমান্ডার।
সাহিত্যে সংগ্রামে ভাস্বর নাম তাঁর
সকলের ভালোবাসা তিনি রউফ কমান্ডার।

*(কমান্ডার আব্দুর রউফ (১৯৩৩-২০১৫)।
ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত।
বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর।
রচনাকাল : ঢাকা, ২৪ নভেম্বর ২০১৯)*

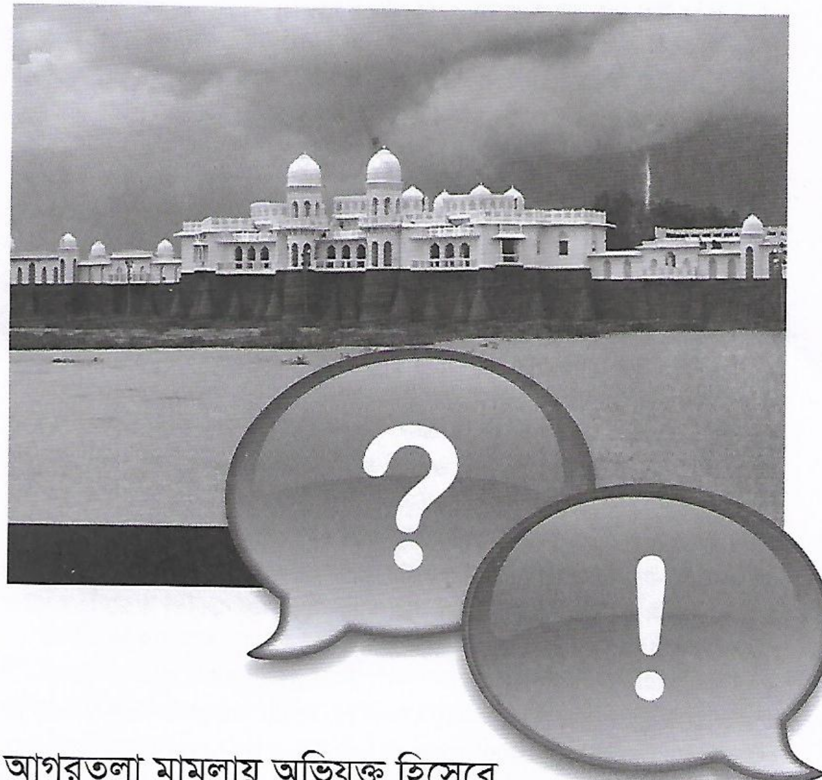

আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত হিসেবে কমান্ডার আবদুর রউফ-এর কাছে উত্থাপিত

প্রশ্নের লিখিত জবাব

প্রশ্ন-১ : পাকিস্তান তো একটি স্বাধীন দেশ ছিল। সেই স্বাধীন দেশকে বিভক্ত করে বাংলাদেশ নামক আরেকটি স্বাধীন দেশ গঠনের চিন্তা আপনি কেন করেছিলেন?

উত্তর : তৎকালীন ব্রিটিশভারতে ধর্ম-সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দ্বিধা বিভক্ত করে পাকিস্তান নামে একটি কৃত্রিম রাষ্ট্রের জন্ম হলেও গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে পাকিস্তানের নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্যে কারো কারো মনে এই আশাবাদ জন্মেছিল যে, পাকিস্তান হয়ত একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠবে এবং সেখানে নতুন ভাবাদর্শে একটি জাতিঃ-চেতনার সৃষ্টি হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। জিন্নাহর মৃত্যুর পর অচিরেই উত্তর ভারত থেকে আগত আমলা ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের আমলা, ভূস্বামী ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের সম্মিলিত চক্রের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের অশুভ লড়াইয়ে নেমে পড়ে। এই আবর্তে শুধু গণতন্ত্রই নয়, একটি স্বাধীন

রাষ্ট্র ও জাতি নির্মাণের সম্ভাবনাও সমূলে তিরোহিত হয়ে পড়ে। সে অবস্থায় সামগ্রিকভাবে পাকিস্তান একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল একথা বলা চলে না। প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের হত্যার পর প্রকৃত প্রস্তাবে পাঞ্জাবি আমলা-ভূস্বামী ও রাজনৈতিক চক্রই পাকিস্তানের সমুদয় রাষ্ট্র ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে এবং পূর্ববাংলার জনগণ দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হয়। তখন থেকেই পূর্ববাংলায় চলতে থাকে জাতিগত নিপীড়ন, অর্থনৈতিক শোষণ এবং বাঙালির শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধ্বংস করার অশুভ প্রচেষ্টা। ফলে পূর্ববাংলা পরিণত হয় আধা-সামন্তবাদী, আধা ঔপনিবেশিক, জাতিগত নিপীড়নের শিকার একটি হতভাগ্য জনপদে। সুতরাং বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলনকে পাকিস্তান নামক একটি স্বাধীন দেশকে বিভক্ত করার লড়াই বিবেচনা করলে শুধু ভুল করা হবে। পক্ষান্তরে একটি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা প্রকৃতপক্ষে হাজার হাজার বছরের সংগ্রামী ঐতিহ্যে গড়ে ওঠা বাঙালি জাতির স্বাধীন সত্তা নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে একটি সমৃদ্ধ জাতীয় অর্থনীতি ও স্থিতিশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলারই পদক্ষেপ মাত্র।

প্রশ্ন-২: বাংলাদেশের স্বাধীনতার চিন্তা আপনি কখন থেকে করেছিলেন?

উত্তর: কখন থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার চিন্তা শুরু করি এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে একটি অস্পষ্ট ধারণা জন্মেছে ছেলেবেলাতে, পরে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর নির্বাচন, ৯২-ক ধারা জারি– ইত্যাকার নানাবিধ রাজনৈতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে আমার চেতনা ক্রমে শানিত হয়ে উঠে।

আমার ছেলেবেলা থেকেই আমি চলমান রাজনীতির একজন মনোযোগী দর্শক ও ধৈর্যশীল শ্রোতা ছিলাম। স্বাধীন বাংলাদেশের ধারণা খুব অল্প বয়সেই আমার মাথায় চেপেছিল। আর এর মূলে ছিলেন আমার এক চাচা।

আমি তখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। ভৈরব কে বি হাই স্কুলে পড়ি। আমার চাচা জিন্নাত আলী কলকাতা প্রেডিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি তৎকালে কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থিত প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন ছাত্র ফেডারেশনের কয়েকজন সক্রিয় কর্মীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের জনাব এ কে এম আহসান, পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিসের জনাব আবদুর রহিম ও অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী প্রমুখের সংস্পর্শও তিনি পান। সম্ভবত এদের অনুপ্রেরণায় তিনি স্বাধীন বঙ্গ প্রস্তাবটির উৎসাহী সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন।

আমার আব্বাও মুসলিম লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আমাদের বাড়িতে একটা লাইব্রেরি ছিল। ছিল যেকোনো বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করার মুক্ত পরিবেশ। রাজনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর তর্ক-বিতর্ক হতো। জিন্নাত আলী চাচা প্রায়ই তর্কে অংশ নিতেন। সে সময়ে গোঁড়া মুসলিম লীগ সমর্থকদের সঙ্গে স্বাধীন বাংলার পক্ষ নিয়ে তার জোরালো বাকবিতণ্ডা আমি উপভোগ করতাম। ১৯৪৬ সালে শরৎ বসু, সোহরাওয়ার্দি,

আবুল হাশিম প্রমুখ যে অখণ্ড স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব রেখেছিলেন, সেটা গ্রহণ না করা যে আমাদের জন্য যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হয়েছে– আমার চাচার এ বক্তব্যটি আমি মনে মনে দারুণভাবে সমর্থন করতাম। আমার দৃষ্টিতে এ চাচাটিকে ব্যতিক্রম বলেই মনে হতো। আমি মন দিয়ে এসব কথাবার্তা শুনতাম।

কিশোর বয়সে পাঠ্যবইয়ে শিবাজীর স্বাধীনতা যুদ্ধ, খণ্ড খণ্ড সংশস্ত্র প্রতিরোধের কথা, ছোটখাট আন্দোলনের কথা আমি পড়েছি। সেই কিশোর বয়স থেকেই মনে হয়েছে, বড় হয়ে আমি দেশের জন্য অবশ্যই কিছু করব। এ ধরনের একটা অস্পষ্ট ধারণা ও প্রত্যয় নিয়ে আমি ক্রমে বেড়ে উঠেছি।

১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় যখন শুরু হয় তখন আমি অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। এই আন্দোলনের যথার্থতা সম্পর্কে আমার কিশোর মনে কোনো সংশয় ছিল না। তাই কাল বিলম্ব না করেই আমি ভৈরব স্কুল-কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মিছিলে যোগ দিয়েছিলাম। ঐ সময়ের একটা তিক্ত স্মৃতি অবশ্য এই মুহূর্তে বিশেষভাবে মনে পড়ছে। ছাত্রদের ভাষা আন্দোলনের মিছিলের প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থন কিংবা সহানুভূতি তখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। বরং অনেক ক্ষেত্রে বিরূপতাই লক্ষ্য করা গিয়েছে। একদিন মিছিলকারী ছাত্রদের ওপর ভৈরব বাজারের এক কাগজ বিক্রেতা থু থু পর্যন্ত ছিটিয়ে দিয়েছিল। আমরা সান্তনা খোঁজার উদ্দেশ্যে আমার আব্বার কাছে এসে উপস্থিত হলাম। মুসলিম লীগের রাজনীতি করলেও আব্বা বাংলা ভাষা আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। তিনি বাড়ির সামনে ঘাসের ওপর গাছের ছায়ায় আমাদেরকে হরিণ আর শিকারীর সেই বিখ্যাত গল্পটি বললেন, যেখানে একটা হরিণকে তাড়া করছে একটি বাঘ। এরই মধ্যে এলেন এক শিকারী। তিনি বাঘটিকে হত্যা করে হরিণটিকে খাঁচাবন্দী করলেন।

হরিণটি শিকারীর কাছ থেকে কী ধরনের আচরণ পাবে? হয় বন্দী পোষ্য জীবন, নতুবা জবাই। বাঙালিদের অবস্থাও খাঁচায় আবদ্ধ হরিণের মতো। সেদিন আব্বার কথা থেকে আমরা এটুকু বুঝে নিয়েছিলাম যে, পাকিস্তানি শাসকচক্র বাঙালিদের অধিকার পদদলিত করতেই থাকবে। অন্যদিকে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে মুক্তিলাভের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

১৯৫০ সালে আওয়ামী লীগের তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় ভৈরবে। এরপর এই সাহসী তরুণ নেতার সঙ্গে আমার অনেক দেখা হয়েছে। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের বিজয়, এই তরুণ নেতার মন্ত্রিত্ব লাভ ও আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রধান নেতায় রূপান্তর প্রভৃতি ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করেছি সচেতনভাবে।

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসক আইয়ুব খান এবডোর (Elective Bodies Disqualification Order সংক্ষেপে EBDO) মাধ্যমে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে প্রায় সকল নেতার মস্তকই নত করে ফেলেন। রাজনৈতিক অধিকারহারা হয়ে যান অনেকে-

ই। এই অন্যায় ব্যবস্থার রুখে দাঁড়িয়েছিলেন শেখ মুজিব। এবডো চ্যালেঞ্জ করে অনেকগুলো মামলায় সাহসের সঙ্গে আত্মপক্ষ সমর্থন করে তিনি জয়ী হন। তখন থেকে আমার কেবলই মনে হতো যে, এই আপসহীন নেতাই একদিন বাঙালির মুক্তির লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসবেন।

প্রশ্ন-৩ : সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনার সঙ্গে আপনি কীভাবে যুক্ত হয়েছিলেন?

উত্তর : করাচির ড্রিগ রোডে অবস্থিত পি-এন-এস কারাসায় নামক একটি নৌস্থাপনায় ১৯৬৬ সালের মাঝামাঝি থেকে আমি চাকরিরত ছিলাম। সে সময়ে আরেকজন বাঙালি অফিসার লে. মতিউর রহমানও একসঙ্গে চাকরি করতেন। দুজনেরই ফ্যামিলি কোয়ার্টার্স ছিল কাছাকাছি। স্বাভাবিকভাবেই আমরা খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম, কেবল ব্যক্তিগতভাবে নয়, পারিবারিকভাবেও।

এক সময় বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম যে, লে. রহমান প্রায়শ কেমন জানি আনমনা, চিন্তামগ্ন ও বিষণ্ন হয়ে থাকে। প্রাণবন্ত মানুষটির পক্ষে এটা একেবারেই ব্যতিক্রম। একদিন তাই কৌতূহল দমন করতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে বসলাম, 'কী হয়েছে রহমান সাহেব?' উত্তরে তিনি বিমর্ষভাবেই বললেন, 'পেটে কথা রাখতে পারলে বলব, পারবেন?' কিন্তু সরাসরি কিছু বললেন না। এমনিভাবে ভূমিকা করেই তিনি কয়েকদিন পার করে দিলেন। আমিও নাছোড়বান্দা। আঠার মতো লেগে থাকলাম। বেশ চাপাচাপির পর লে. রহমান খুব সঙ্গোপনে বললেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি গুরুতর। এক দফার দাবি উঠেছে। অনেকেই পূর্ব পাকিস্তান আলাদা করতে চায়। করাচিতেও এর সপক্ষে কাজকর্ম চলছে। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে কিছু সামরিক বেসামরিক লোক ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে।' লে. রহমান আরো বললেন, 'এ মুহূর্তে কারো নাম বলতে চাই না, তবে নিজেও এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছি।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে তিনি থামলেন, আমি কিছুটা বিহ্বল হয়ে পড়লাম। এমন একটা ব্যাপার সশস্ত্রবাহিনীতে ঘটছে, অথচ আমি এর কিছুই জানি না। আর এগুলো যে আমারও প্রাণের কথা। আমার আবেগ ও বিহ্বল দেখে রহমান সাহেবও চমকিত হলেন। দুজনেই কিছুক্ষণ নীরব থাকলাম। শেষে নীরবতা ভঙ্গ করে রহমান সাহেবই আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'কি ব্যাপার কথা বলছেন না কেন?' আমি বললাম, 'কথাগুলো তো শুনলাম, একটু আত্মস্থ হয়ে নিই।' আসলে কিছু বলার মতো মানসিক অবস্থা তখন আমার ছিল না।

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পর আমরা উভয়ে আসল কাজে তৎপর হলাম। ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝিতে কোনো এক ছুটির দিনে আমার ছোট্ট ফিয়্যাটে বসে আমরা দুজন বেরিয়ে পড়লাম। লে. রহমানই পথঘাট চিনিয়ে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন। করাচির মার্টিন কোয়ার্টার্সে এলে তিনি আমাকে গাড়ি থামাতে বললেন। এখানে কিছু সরকারি বেসামরিক কোয়ার্টার ছিল। এতে বেশ কিছু বাঙালি বসবাস করত। এটি মূলত গেজেটেড ব্যক্তিবর্গের বাসস্থান।

সেখানকার কোনো এক কক্ষে একটা গোপন বৈঠক চলছিল। প্রচুর লোকজনের উপস্থিতি লক্ষ করলাম। প্রথমেই মতিউর রহমান উপস্থিত সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। বিমানবাহিনীর চার-পাঁচ জন এবং নৌবাহিনীর পাঁচ-সাত জনকে দেখতে পেলাম। এদের সঙ্গে আমার আগে পরিচয় ছিল না। অবশ্য কিছু পরিচিত লোকের উপস্থিতিও লক্ষ করলাম। একটি টেক্সটাইল মিলের প্রোডাকশন ম্যানেজার জনাব মাহবুব উদ্দিন চৌধুরীকে দেখলাম। ভদ্রলোকের বাড়ি সিলেট। এছাড়াও লির্ডি সীম্যান সুলতান আহমদ, বিমানবাহিনীর করপোরাল সিরাজ, ফ্লাইট সার্জেন্ট জলিল এতে উপস্থিত ছিলেন। এরা পরবর্তীতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হন। বলা যায় এভাবেই সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনায় আমি যুক্ত হয়ে পড়েছিলাম।

প্রশ্ন-৪ : বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরিকল্পনা সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আপনার কখনো আলাপ আলোচনা হয়েছিল?

উত্তর: আগতলা মামলায় আটক থাকাকালীন সময়ের পূর্বে এ প্রসঙ্গে তার সঙ্গে আমার কোনো আলাপ আলোচনা হয় নাই।

প্রশ্ন-৫ : আপনাদের সাংগঠনিক নেট-ওয়ার্ক ছিল এবং সেই নেট-ওয়ার্কে আপনার অবস্থান কি ছিল?

উত্তর : লে. রহমান এবং করাচিতে সংগঠিত গ্রুপটির অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সে সময়ে আমি স্বাধীন বাংলা আন্দোলনের অনেক তথ্য এবং ইতিহাসও জানতে পারি। রহমান সাহেবের কাছ থেকে জানতে পারলাম, ১৯৬২-এর দিকে করাচির মনোরা দ্বীপের হিমালয়াতে বাঙালিদের একটা ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশন ছিল। বাঙালি নাবিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই এই সংগঠনের জন্ম। এর নেতা ছিলেন লিডিং সীম্যান সুলতান। তাঁর সঙ্গে আরো জড়িত ছিল স্টুয়ার্ট মুজিব, সীম্যান নূর মোহাম্মদ প্রমুখ। সে সময়ে অফিসারদের বিরুদ্ধে সীম্যানদের যে সমস্ত ভয়ানক অভিযোগ ও ক্ষোভ ছিল, সেই ক্ষোভই এ ধরনের এসোসিয়েশনের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি নৌবাহিনীর অফিসার ও নাবিকদের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য গড়ে তোলে যা পাকিস্তান আমলেও অব্যাহত ছিল। এর ফলে অফিসারদের কাছে নাবিকরা মনুষ্যসুলভ ব্যবহার পাওয়া থেকে বঞ্চিত হতো। ব্রিটিশ আমলে অফিসারদের বড় অংশ ছিল ইংরেজ। আর পাকিস্তানি জামানায় এদের বেশিরভাগই হলো অবাঙালি। স্বাভাবিকভাবেই অফিসার বিদ্বেষ শেষ পর্যন্ত জাতিগত বিদ্বেষে রূপ নেয়।

এই সংগঠনের সংগঠকরা যাদের আপনজন বলে মনে করেছে তাদেরকেই এর সদস্য করে নিয়েছে। যেহেতু তখন বাঙালি অবাঙালি বিভাজন সামনে আসে তাই বাঙালি অফিসাররাও নাবিকদের আপনজন হয়ে যায়। এভাবে কিছু অফিসারও ঐ সংগঠনের সদস্য হয়ে পড়ে। লেফটেন্যান্ট মোজাম্মেল ছিলেন এর একজন সক্রিয় সদস্য। তিনি ক্যাটারিং ব্রাঞ্চের নিম্ন

পদ থেকে পদোন্নতি পেয়ে সাব-লেফটেন্যান্ট হয়েছিলেন। সীম্যানরা তাকে নিজেদের আপনজন বলে মনে করত। এই ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন তথা ৬ দফার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ে। নাবিকদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতেন এমন কিছু অফিসার যেমন লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রাঞ্চের লোক, করাচির টেকনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট পি.এন.এস. কারসাযে কর্মরত থাকার সময় লে. রহমানের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। এভাবেই লে. রহমান এ আন্দোলনে একাত্ম হন। আর এভাবেই এ সংগঠন গড়ে উঠেছিল নাবিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য তা শেষ পর্যন্ত বাঙালিদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধাবিত হলো। শুধু নৌবাহিনী নয় সশস্ত্রবাহিনীর অন্যান্য শাখার বাঙালি বেশ কিছু সদস্যও কালক্রমে এই সংগঠন ও আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে। কেবলমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানে নয়, পূর্ব বাংলায়ও ক্রমান্বয়ে এই কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত হয়েছিল।

১৯৬৬-এর দিকে লে. মোয়াজ্জেম পূর্ব পাকিস্তানে বদলি হয়ে আইডব্লিউটিতে ডেপুটেশনে চলে আসেন। স্টুয়ার্ট মুজিব পালিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে আসেন। স্বাধীন বাংলা আন্দোলনের কর্মীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে যতদূর জেনেছি তাতে করে এই আন্দোলনের কর্মীদের সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা আমার মধ্যে গড়ে উঠল। আমার মনে হলো, এদের সবার মনে প্রচণ্ড ব্যথা আছে, তবে এদের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা নেই। ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করার ক্ষমতা নেই। আছে কেবল আবেগ আর উচ্ছ্বাস। আমি যেহেতু স্বাধীন বাংলা আন্দোলনের শেষ রাতের নায়ক, অনেক তত্ত্ব, তথ্য জানতে হয়। আমি হাজারো প্রশ্ন করি, নিজেকেই নিজে জেরা করি, পরে সিদ্ধান্তে পৌছি। তাই খুঁটিনাটি সব তথ্যই আমার কাজের জন্য মূল্যবান। এইসব কারণে আমি নবাগত হলেও আন্দোলনের কর্মীদের কাছে গুরুত্ব পেতে থাকলাম। এরই মধ্যে আমি অনেকের কাছে, এমনকি রহমান সাহেবের দৃষ্টিতেও করাচিতে স্বাধীন বাংলা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত চক্রটির নেতা বনে গেলাম।

রহমান সাহেবের কাছ থেকে তখন জানতে পারলাম যে, মোয়াজ্জেম সাহেব পূর্ব পাকিস্তানে ইতোমধ্যেই আন্দোলনের কাজে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। তিনি ১৬ জন এসপি ও ১৩ জন ডিসি-র সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, যারা সবাই এ আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থক হিসেবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য দৌড়াদৌড়ি করছেন। রহমান সাহেব আরো জানালেন, ইতোমধ্যে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে চলেছেন মোয়াজ্জেম সাহেব। তবে সেনাবাহিনীর অংশটির সঙ্গে তখন পর্যন্ত ঐকমত্যে পৌছানো যায়নি বলে পুরো কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

সে সময়ে অতীত কাজের আরো একটি নতুন তথ্য পেলাম। ১৯৬২-৬৩-এর দিকে কর্নেল ওসমানীর নেতৃত্বে বেঙ্গল রেজিমেন্টের কিছু বাঙালি অফিসার স্বাধীন বাংলা আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তখন সে আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য ছিলেন তৎকালীন ক্যাপ্টেন শওকত আলী, ক্যাপ্টেন মঞ্জুর, মেজর শামসুল আলম, মেজর খুরশীদ উদ্দিন, ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামানসহ আরো অনেকে। তবে তাঁরা বাঙালি সৈনিকদের শক্তি ও সংখ্যা উল্লেখযোগ্য

বৃদ্ধি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাকে শ্রেয় মনে করেন। কারণ কম সৈন্য নিয়ে বিদ্রোহ করার অর্থই হলো পশ্চিমাদের দ্বারা পিষ্ট হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া, জয়লাভ তো দূরের কথা। কর্নেল ওসমানী মনে করতেন যে, দশটি বাঙালি রেজিমেন্ট গঠিত হওয়া ছাড়া বিদ্রোহ সফল হবে না। তাই তারা বিলম্ব করার সিদ্ধান্ত নেন।

প্রশ্ন-৬ : মামলার সরকারি নাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব এবং অন্যান্য'। কিন্তু এর নামকরণ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কীভাবে হলো এবং এ সম্বন্ধে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

উত্তর : তৎকালীন সরকারের নির্দেশেই পত্রপত্রিকায় মামলাটিকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে চালিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। নামটি সাধারণ মানুষের কাছে সেভাবেই পরিচিতি লাভ করে। এরকম নামকরণে সরকারের গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল এটাই প্রতিভাত করা যে, ভারতীয় অনুপ্রেরণায় ভারতের আগরতলা শহরে বসে সলাপরামর্শ করেই আমরা একটি ষড়যন্ত্র পাকিয়েছিলাম যাতে সাধের পাকিস্তান ধ্বংস হবে এবং ভারতেরই লাভ হবে; আমরা ভারতের এজেন্ট মাত্র এবং আমাদের কর্মকাণ্ডে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানি বাঙালির কোনোই সুবিধা হবে না। ইতিহাস প্রমাণ করেছে- জাতিগত শোষণ ও নির্যাতনের শিকার বাঙালিদেরকে তারা ধোঁকা দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। আমাদের বিরুদ্ধে মামলাটি বরং সকলকে জাতীয় মুক্তির লড়াইয়ে দুঃসাহসী ভূমিকা নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

প্রশ্ন-৭ : আপনাদের সশস্ত্র পরিকল্পনার সঙ্গে ভারতের কোনো সংযুক্তি ছিল কি?

উত্তর : এ ধরনের কোনো তথ্য আমার জানা নাই।

প্রশ্ন-৮ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আগরতলা মামলা সম্বন্ধে আপনার মূল্যায়ন কি?

উত্তর : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সঠিক বিশ্লেষণ করতে হলে বাঙালির লড়াই সংগ্রামের ধারাটি এবং এ লড়াইয়ের ক্রমবিকাশের পর্যায়গুলো লক্ষ করতে হবে। ১৯৪৬ সালের স্বাধীন অখণ্ডবাংলা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, গণতান্ত্রিক বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা, ১৯৫২-এর ভাষাসংগ্রাম, স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন এবং আওয়ামী লীগের ৬ দফা আন্দোলন– এ সকল আন্দোলনে আমাদের রাজনৈতিক চেতনা শাণিত হয়েছে, দাবি আদায়ের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়েছে এবং নতুন প্রজন্মের রাজনৈতিক কর্মীরা ক্রমে দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। ষাটের দশকের মাঝামাঝিতে দুটি প্রশ্ন আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে যা নিয়ে প্রকাশ্যে এবং গোপনে অনেক বিতর্কেরও সূত্রপাত হয়েছে। প্রথম প্রশ্নটি এই যে, নিরঙ্কুশ জাতীয় অধিকার পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিতরে থেকে সম্ভব, নাকি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হবে? আগরতলা মামলাটি সম্পর্কে আমার মূল্যায়ন এই যে, এ দুটি প্রশ্নেরই সুস্পষ্ট জবাব এ মামলার মাধ্যমে বেরিয়ে এসেছে। এ মামলার অভিজ্ঞতাই বলে দিয়েছে যে, (১) আমাদের

জাতীয় মুক্তির লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং (২) স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্যে আমাদের সশস্ত্র লড়াইয়ে নামতে হবে। প্রকৃত পক্ষে আমরা যারা এই মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলাম, অভিযুক্ত না হলেও যারা আমাদের সঙ্গে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে সম্পৃক্ত ছিলেন, তারাই সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ কায়েমের পথিকৃৎ– অগ্রবাহিনী। ১৯৭০-এর নির্বাচনে এ দেশের মানুষ ৬ দফাকে ভোট দিয়েছে স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখেই। ১৯৭১ সালে অস্ত্র হাতে নিয়েছে তাদের প্রাণের এ আকাঙ্ক্ষাকে অর্জন করার জন্যেই। এভাবেই মুক্তি সংগ্রামের উত্তরণ ঘটেছে মুক্তিযুদ্ধে। আগরতলা মামলার ভূমিকাটি এখানে অনন্য এবং সন্দেহাতীতভাবে সুস্পষ্ট।

প্রশ্ন-৯ : শুধুমাত্র বেসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য।

ক. পাকিস্তান সরকারের বেসামরিক চাকরিতে বাঙালিদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করা হতো? কোনো ঘটনা বা স্মৃতি মনে আছে কি?

উত্তর : প্রযোজ্য নয়।

প্রশ্ন-১০ : (ক) : শুধুমাত্র বেসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য-

ক. পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনী বাঙালিদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করা হতো? কোনো ঘটনা বা স্মৃতি মনে আছে কি?

উত্তর : ১৯৬৪ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৬৬ সালের জুন পর্যন্ত আমি ঢাকাতে নেভাল রিক্রুটিং অফিসার হিসেবে কর্মরত। লক্ষ করে দেখলাম যে, পাকিস্তানি সামরিক জান্তা নানা অজুহাতে বাঙালিদের সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদানে বাধার সৃষ্টি করত। প্রধান অজুহাতটি ছিল, পূর্ব পাকিস্তানিরা সশস্ত্রবাহিনীতে যোগদানের জন্যে দৈহিকভাবে উপযুক্ত নয়। কিন্তু কার্যত চক্রান্তটি ছিল অন্য জায়গায়। পাক আর্মিতে বাঙালিদের জন্য কোটা নির্ধারিত ছিল। দেখা গেছে, সশস্ত্রবাহিনীতে একমাত্র পশুপালন কোরেই বাঙালিদের সংখ্যা ছিল বেশি, তাও শতকরা ১৮ ভাগ। এরপরের অবস্থান ছিল ইঞ্জিনিয়াসং মেকানিক্যাল কোরের। এখানে বাঙালি ছিল শতকরা ১২ থেকে ১৫ ভাগ। আর সাঁজোয়াবাহিনীতে বাঙালি ছিল শতকরা মাত্র ২ ভাগ। পদাতিক ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টেই কেবল পূর্ব পাকিস্তানিদের নেওয়া হতো বেশি, শতকরা ৮০ ভাগ। এখানে অবশ্য বেশ কিছু ফাঁক থেকে গিয়েছিল যার ফলে বাঙালিরা বঞ্চিত থেকে যাচ্ছিল।

পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীতে ইস্ট বেঙ্গল, বালুচ, পাঞ্জাব- এ রকম অনেকগুলো রেজিমেন্ট ছিল। প্রত্যেক রেজিমেন্টে স্ব স্ব অঞ্চলের লোক থাকত শতকরা ৮০ ভাগ। কিন্তু ধাপ্পাবাজিটা হলো ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল যেখানে মাত্র ৪টা ও বালুচ-পাঠান মিলে

২০টা, সেখানে শুধু পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সংখ্যাই ছিল অন্যূন ৪০টা। সঙ্গত কারণেই সশস্ত্র বাহিনীতে বাঙালিদের সংখ্যা ছিল আশঙ্কাজনকভাবে কম। কিন্তু যখনই বাঙালিদের সশস্ত্রবাহিনীতে নেওয়ার কথা উঠত, তখনই স্বার্থান্বেষী মহল অজুহাত হিসেবে বলত, যোগ্যতা নেই বলে তাদের সংখ্যা কম। এই অজুহাতটাকে আরো যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করার জন্য বাঙালিদের শারীরিক মাপের যোগ্যতা শিথিল হওয়া সত্ত্বেও সেনাবাহিনীতে বাঙালির সংখ্যা তেমন বাড়তে পারত না। প্রসঙ্গ বলা প্রয়োজন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে সশস্ত্রবাহিনীতে সৈনিক হিসেবে যোগদানের শারীরিক যোগ্যতা ছিল ৫ ফিট ৬ ইঞ্চি, আর পূর্ব পাকিস্তানিদের জন্য ছিল ৫ ফিট ৪ ইঞ্চি। অফিসারদের ক্ষেত্রে পরিমাপ পশ্চিম পাকিস্তানিদের জন্য ৫ ফিট ৬ ইঞ্চি ও বাঙালিদের জন্যে ৫ ফিট ২ ইঞ্চি। ই.পি.আর-এ (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস) যোগদানের শারীরিক মাপকাঠি ছিল ৫ ফিট ৬ ইঞ্চি। উল্লেখিত শারীরিক যোগ্যতায় সশস্ত্রবাহিনীতে যোগদানের উপযোগী প্রচুর লোক পাওয়া যেত পূর্ব পাকিস্তানে। অথচ পাকিস্তানি সামরিক চক্র সর্বদা অজুহাত দেখাত যে, পূর্ব পাকিস্তানে যোগ্য লোক পাওয়া যাচ্ছে না। সাধারণ মানুষ জাতিগত নিপীড়ন সৃষ্টিকারীদের এসব ভাঁওতাবাজি তেমনভাবে বুঝতে পারত না। কিন্তু নৌবাহিনীর লোক হিসেবে আমার কাছে তা ছিল দিবালোকের মতোই স্পষ্ট। বঞ্চনার অনেক তথ্যই আমার কাছে ছিল। এ ধরনের অনেক তথ্য আমি ড. আলীম আল রাজিকে সরবরাহ করেছি। তিনি তা সংসদে উত্থাপনও করেছেন। এ নিয়ে জনমনে বেশ আলোড়নও সৃষ্টি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তা পাকিস্তানি সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের কাছে আর অজানা থাকেনি। এক পর্যায়ে এ ব্যাপারে সামরিক সদর দফতরের কর্মকর্তারা আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেন। এই ঘটনার সূত্র ধরেই পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সঙ্গে সশস্ত্রবাহিনীতে কর্মরতদের কোনো ধরনের যোগাযোগ না রাখার জন্যে একটি সার্কুলার ইস্যু করা হয়।

আরেকটি বিশেষ ঘটনার কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, যার দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতি পশ্চিমাদের বিমাতাসুলভ আচরণ স্পষ্ট হবে। আমি ঢাকায় থাকার সময়ে নৌবাহিনীর ক্যাডেট হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে দু'জন তরুণ নির্বাচিত হয়। নিয়ম অনুযায়ী তাদের আমার কাছে রিপোর্ট করার কথা। নৌবাহিনীর ঢাকাস্থ লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবে আমার দায়িত্ব ছিল নির্বাচিত ক্যাডেটদের বিমানযোগে করাচি পাঠানোর যথাযথ ব্যবস্থা করা। নির্বাচিত দুজন ক্যাডেটের মধ্যে একজন রেলওয়েতে কর্মরত রিজভী সাহেবের ছেলে, দিল্লিওয়ালা। সে যথাসময়ে আমার কাছে রিপোর্ট করে। আমি যথারীতি তাকে করাচি পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম। আর একজন ক্যাডেট সোলায়মান। বাড়ি ভোলায়। সে কিন্তু সময়মত নিয়োগপত্র পায়নি। আসলে পশ্চিমা নিয়োগকর্তারা ষড়যন্ত্র করেই তার নিয়োগপত্র দেরি করে পাঠায় যাতে সে যথাসময়ে যোগদান করতে না পারে। লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানি নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের টেলিগ্রামের কপি আসত, পরে আসত চিঠির কপি। আমি একটি টেলিগ্রামের কপি পেলাম, যেটি করাচি থেকে কোনো এক মাসের ২২/২৩ তারিখে ভোলার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে এবং পরবর্তী মাসের ২ তারিখের মধ্যে সোলায়মানকে করাচিস্থ ন্যাভাল একাডেমিতে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। টেলিগ্রামটি পেয়ে আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। কারণ ভোলা থেকে কোনো অবস্থাতেই করাচিতে উক্ত

সময়সীমার মধ্যে তার পক্ষে পৌঁছানো সম্ভব নয়। আমার মনে হলো এটিও একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র।

বাঙালি হিসেবে সোলায়মানের প্রতি আমার মন সহানুভূতিশীল হলো। আমি তার জন্য কিছু করতে উদ্যোগী হলাম। তাৎক্ষণিকভাবে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, ক্যাডেট সোলায়মানের চাকরিটা যে কোনো মূল্যে বহাল রাখার ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে। বিষয়টা নিয়ে ঢাকাস্থ নৌবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে পরামর্শ করলাম। তারপর আমি বের হলাম সোলায়মানকে খুঁজতে। সে তখন ঢাকাতেই অবস্থান করছিল। অনেক খোঁজাখুঁজি করে সোলায়মানকে পাওয়া গেল। সে তখন ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। তার সঙ্গে কথা বললাম। তার সঙ্গে আলাপ করে আমার মনে হলো, সে নৌবাহিনীতে যোগ দিতে ইচ্ছুক নয়। তাকে আমি আমার মনের মাধুরী মিশিয়ে অনেক বুঝালাম। 'বাঙালি হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেরই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু না কিছু করা উচিত। আর বাঙালিদের জন্য কিছু করতে চাইলে নিজের দেশ ও জনগণের স্বার্থে তোমার এই চাকরিতে যোগ দেওয়া উচিত।' অবশেষে সে রাজি হলো। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। তখন দ্রুত করাচির ন্যাভাল হেড কোয়ার্টারে আমি একটি সিগন্যাল পাঠালাম। সিগন্যালটি ছিল এরকম, 'টেলিগ্রাম পেয়েছি। কিন্তু করাচি থেকে ২২ তারিখে পাঠানো টেলিগ্রামের নির্দেশ মতে ভোলা থেকে কোনো অবস্থাতেই সোলায়মানের পক্ষে ২ তারিখে করাচি পৌঁছানো সম্ভব নয়। যাহোক, ক্যাডেট সোলায়মানের জন্যে আমি টিকিটের ব্যবস্থা করেছি। সে আসামাত্রই করাচি ন্যাভাল একাডেমিতে রিপোর্ট করার জন্যে পাঠানো হবে।' একই সঙ্গে সিগন্যালের একটি অনুলিপি রাওয়ালপিন্ডি সামরিক সদর দফতরে এ.জিস ব্রাঞ্চে জেনারেল আতিকুর রহমানের কাছেও পাঠালাম। কিন্তু কেন জানি মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। মনে হলো, এরপরও সোলায়মানের চাকরিটা হয়তো হবে না। ভাবলাম, সিগন্যাল একটা কপি প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারিয়েটে পাঠিয়ে দেই, যা হবার হবে। শেষ পর্যন্ত তাই করলাম। আর এটা নিয়েই পশ্চিম পাকিস্তানে ন্যাভাল হেড কোয়ার্টারে তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে গেল।

যাহোক, ন্যাভাল হেডকোয়ার্টার থেকে আমাকে অনেক গালাগালি দেবার পর টেলিফোনে লে. কমান্ডার রশিদ বললেন, 'সোলায়মানের চাকরি থাকবে, দুশ্চিন্তার কারণ নেই।' এর পরেই উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন– In the mean time, have you released this measage to the Press also? এতক্ষণে ওদের রাগ আর উৎকণ্ঠার পটভূমি আমার কাছে কিছুটা স্পষ্ট হলো।

৬৬ সালে পি.এস.এস কারসাযে চাকরিকালীন আরেকটি ঘটনা। নৌবাহিনীতে রিকোয়েস্ট ডিফলটার নামে একটি কার্যক্রম প্রচলিত আছে। কমান্ডার অথবা ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে থেকে নাবিকদের অপরাধের বিচার-আচার কিংবা তাদের কোনো প্রার্থনা থাকলে সেটা মঞ্জুর করেন। ডিভিশনাল অফিসাররা নিজ নিজ ডিসিশনের অন্তর্ভুক্ত নাবিকদের প্রতিনিধি হিসেবে 'রিকোয়েস্ট ডিফলটার' অনুষ্ঠানে হাজির থাকেন। কারসাযে ডিভিশনাল অফিসারের দায়িত্ব পালনকালে আমিও এই ধরনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতাম।

এমনি একটি রিকোয়েস্ট ডিফলটার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কারসায়ের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন আবেদ। ডিভিশনাল অফিসার হিসেবে আমিও সে অনুষ্ঠানে যথারীতি হাজির ছিলাম। নৌবাহিনীতে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ফান্ড নামে একটা ফান্ড ছিল। এ ফান্ড থেকে টাকা নেয়ার জন্য অনেকে আবেদন করতেন। ডিভিশনাল অফিসার রাজি হলে ক্যাপ্টেন আবেদ তা মঞ্জুর করতেন। রিকোয়েস্ট ডিফলটারে সেদিন পূর্ব পাকিস্তানের একটি ছেলের দরখাস্ত পড়া হলো। আবেদনকারী জানিয়েছে যে, ঝড়-বন্যায় তার বাড়ির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সে জন্যে ওয়েলফেয়ার ফান্ড থেকে সে কিছু টাকা কর্জ চায়। ক্যাপ্টেন আবেদ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাড়ি? ছেলেটি স্যালুট দিয়ে বলল, স্যার। ক্যাপ্টেন আবেদ আবার জোরের সঙ্গে প্রশ্ন ছুঁড়লেন, তোমার বাড়ি না তোমার বাবার বাড়ি? ছেলেটি এবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ক্যাপ্টেন আবেদ বলে উঠলেন, Why don't you ask loan from your own goverment? অফিসারদের সামনে এমনিতেই নাবিকরা জড়সড় হয়ে থাকে। তদুপরি ক্যাপ্টেন আবেদের প্রশ্নের বহরে বাঙালি নাবিকটির অবস্থা বেশ করুণ হয়ে পড়ল। আমিও বেশ অবাক হলাম আবেদ সাহেবের ব্যবহারে, সবচেয়ে বেশি ধাক্কা খেলাম তার শেষ প্রশ্নটিতে।

ছেলেটি আমার ডিভিশনে কাজ করত না, তাই আমার ঐ মুহূর্তে কিছু করণীয় ছিল না। যদিও ক্যাপ্টেনের শেষের বাক্যটি সম্পর্কে আমার যথেষ্ট জিজ্ঞাসা ছিল এবং প্রতিবাদ করার অভিপ্রায়ও ছিল। তবুও অন্য ডিভিশনের নাবিক আমি রীতি ভঙ্গ করে কিছু বললাম না। আমি শুধু অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলাম ১৮ বছরের দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করা ছেলেটির দিকে। আমি লক্ষ করেছি তার প্রতিক্রিয়া, বুঝতে চেষ্টা করেছি তার চোখের ভাষা। আমার কেবলই মনে হতে থাকল... এসব বড় কর্মকর্তাদের যদি বাঙালি তরুণ নাবিকদের প্রতি এ ধরনের আচরণ করে, তবে কেন তাদের পূর্ব বাংলার কথা মনে হবে না, কেন তারা স্বাধীন বাংলা আন্দোলনের কথায় উত্তেজিত হবে না, উৎফুল্ল হবে না? আর এসব তরুণ যদি সঠিক নেতৃত্ব না পায় তাহলে কী পরিণতি হবে? আর তাইতো তারা আজ রহমান সাহেবের তথা স্বাধীন বাংলা আন্দোলনকারীদের নেতৃত্বে বিস্ফোরণোন্মুখ। রিকোয়েস্ট, ডিফলটার অনুষ্ঠানে এরপর এক পাঞ্জাবি ছেলের দরখাস্ত পড়া হলো, সে তার বোনের বিয়ে উপলক্ষে টাকা কর্জ চায়। ক্যাপ্টেন আবেদ হুংকার ছেড়ে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে ফেললেন এবারে। বললেন, 'ধারকর্জ করে উৎসব করা ইসলাম বরদাশত করে না। আমিও সমর্থন করি না।' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন কমান্ডার রিজভীর দিকে, তার মতামত চাইলেন, তিনি বললেন, 'জী স্যার, আমিও সমর্থন করি না, তবে এবারের মতো দেয়া হোক।' অতঃপর পাঞ্জাবি ছেলেটির আবেদন মঞ্জুর হলো। সে বোনের বিয়ের জন্য টাকা ধার পেল।

এ যাবৎ কোনোক্রমে আমি এসব ন্যক্কারজনক ঘটনা সহ্য করছিলাম, কিন্তু এই পাঞ্জাবি ছেলের বোনের বিয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ করায় আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। অধিবেশন শেষ হলো, যে যার ঘরে ফিরে গেল। আমি কমান্ডার রিজভীর রুমে গেলাম, স্যালুট দিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, 'স্যার আপনার যে পূর্ব পাকিস্তানি নাবিকটিকে নিজ গভর্নমেন্টের কাছ

থেকে কর্জ নেয়ার কথা বললেন, তাহলে পূর্ব পাকিস্তান কি আলাদা রাষ্ট্র? আপনারা আসলে এ কথায় কি বোঝাতে চাইছিলেন? আমরা কি বিদেশে চাকরি করছি? ভিক্ষা চাইছি?' আমি তখন ক্ষোভে কম্পমান, তাই এক নাগাড়ে মনের কোণে জমা হওয়া কথাগুলো বলে ফেললাম। কিন্তু আমার কথার বহর দেখে রিজভী সাহেব অত্যন্ত ক্ষেপে উঠলেন। আমি অবশ্য না রেগে শিষ্টতা বজায় রেখে ঠাণ্ডা গলায় বললাম, 'স্যার, আপনার ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণ কী? আপনি আমার সুপেরিয়র অফিসার। আমি না বুঝলে আমাকে বোঝানো আপনার দায়িত্ব। আপনি বোঝাতে পারলে ভালো, না পারলে তাও সাফ বলে দেন, ক্ষিপ্ত হওয়ার কী আছে?' এবারে চিৎকার করে বলে উঠলেন, Go to your Captain, he knows, I do not know. আমি ভাবলাম ভালোই হলো।

আবেদ সাহেবের সেক্রেটারি লে. মজিদের কাছে গট গট করে গিয়ে বললাম, ও Like to see the Captain. তিনি বললেন, 'একটা স্লিপ দেন।' আমি বললাম, 'তার আর দরকার নেই। আমি যাব।' লে. মজিদ মাদ্রাজি, অত্যন্ত শরিফ ভদ্রলোক। আমি যখন জেলে যাই, তখন তিনি অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে আমার পরিবারের খোঁজখবর রেখেছেন। আমি ক্যাপ্টেন আবেদের রুমে স্যালুট দিয়ে দাঁড়ালাম। আমায় দেখে তিনি হকচকিয়ে গেলেন। সম্ভবত আমার মুখের অবস্থা দেখে তিনি পরিস্থিতি কিছুটা আঁচ করে নিয়েছেন। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, ডযধঃ? আমি বললাম, 'রিজভী সাহেব আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।' এবারে তিনি একটু নরম হলেন।

আমিও অ্যাটেনশন অবস্থা থেকে স্ট্যান্ড অ্যাট ইজ হয়ে একটু রিলাঙদাঁড়ালাম। এবারে ক্ষিপ্ত না হয়ে অত্যন্ত ভদ্রভাবে বিনীত স্বরে আমি বললাম, 'স্যার, আজকের রিকোয়েস্ট ডিফলট-ারে এক পর্যায়ে আপনি বললেন, To ask loan from own govt. আসলে এটির সঠিক অর্থ কি? বাঙালি নাবিকরা তো আমায় বাঙালি অফিসার হিসেবে এ প্রশ্ন করবে, তখন আমি কি ব্যাখ্যা দেব? তাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেয়া তো অফিসার হিসেবে আমার দায়িত্ব।' লক্ষ করলাম, ক্যাপ্টেন আবেদ আসলে ভেতরে জ্বলছে, চোখ লাল হয়ে গিয়েছে। আসল জায়গায় আঘাত পড়েছে। কী আর জবাব দিবেন তিনি! তাই সিনিয়র অফিসার সুলভ গাম্ভীর্য বজায় রেখে তিনি আমায় বলে বসলেন, Now you get out. ও রিষষ বীঢ়ষধরহ রঃ ষবঃবৎ ড়হ. আমি বের হয়ে এলাম। বুঝলাম এবারে আমার হাজামত হবে। রহমান সাহেবকে ঘটনাটি বললাম।

প্রশ্ন-১০ (খ): সশস্ত্র বাহিনীর মতো সুশৃঙ্খলবাহিনীর সদস্য হয়েও আপনি কেন এরকম একটি বিদ্রোহমূলক পরিকল্পনায় যুক্ত হয়েছিলেন?

উত্তর: ১ ও ২ নং-এ প্রদত্ত আমার বক্তব্যে এ প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে।

৩০শে জানুয়ারি ২০০৩

ঢাকা ডিএ ৬১০২ বাঙলাকথা ৯ম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২০, মূল্য ১০০

আই সি বি

পুঁজি বাজারের একটি অনন্য ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

দেশের দ্রুত শিল্পায়ন, পুঁজি বাজার উন্নয়ন এবং তথ্য প্রযুক্তির প্রসারে আইসিবির রয়েছে বহুমাত্রিক কার্যক্রমঃ

১. এককভাবে ও সিন্ডিকেট গঠনের মাধ্যমে লিজ অর্থায়ন;
২. বিদ্যমান বিনিয়োগ হিসাবে শেয়ার কেনার জন্য ঋণ ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান;
৩. ইক্যুইটি এন্ড এন্ট্রাপ্রেনরশিপ ফান্ড (ইইএফ) ব্যবস্থাপনা;
৪. ব্যাংকার টু দি ইস্যু হিসেবে দায়িত্ব পালন ও ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান;
৫. ট্রাস্টি ও কাস্টোডিয়ান হিসেবে দায়িত্ব পালন;
৬. আইসিবি ইউনিট ও আইসিবি এএমসিএল ইউনিট ফান্ড সার্টিফিকেট লিয়েন রেখে অগ্রিম প্রদান;
৭. প্লেসমেন্ট ও ইক্যুয়িটি পার্টিসিপেশনসহ সরাসরি শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয়; এবং
৮. পুঁজি বাজার সংক্রান্ত অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কার্যক্রম।

আইসিবি দিচ্ছে দ্রুত ও সর্বোত্তম সেবার নিশ্চয়তা

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

বিডিবিএল ভবন

৮, রাজউক এভিনিউ (লেভেল ১৪-২১) ঢাকা

ফোন ঃ ৯৫৬৩৪৫৫

ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৬৩৩১৩

ওয়েব ঃ www.icb.gov.bd